মহুয়ার চিঠি

বুদ্ধদেব গুহ

৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মহুয়ার চিঠি

মহুয়ার চিঠি

মহুয়ার চিঠি

আরুশা,

পূর্ব-আফ্রিকা

মহুয়া,

এখানে এসেছি আজ ডার-এস-সালাম্ থেকে প্লেনে। এখান থেকে মোয়াঞ্জার প্লেন যায়। মোয়াঞ্জা? মনে আছে? বিভূতি বাবুর চাঁদের পাহাড় পড়োনি?

কাল বেরুব দিন দশেকের জন্যে। আফ্রিকার গ্রেট রিফট্ ভ্যালী দেখতে যাব। লেক মানীয়ারা, গোরোংগোরো ক্র্যাটার, সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্, ডুটু সাফারি লজ, সেবোনারার দিকে। দেখব, মাসাইদের, ওয়াণ্ডারাবোদের।

ছোটবেলা থেকে কত পড়েছি এই সব জায়গার কথা। জন-হানটার, পোণ্ডারো, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জয় এ্যাডামসন, এবং রবার্ট রুয়ার্ক এর লেখাতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' আর "মরণের ডঙ্কা বাজে"?—সত্যি! এমন বই বোধহয় ছোটদের জন্যে বাংলা সাহিত্যে আর কেউই লিখে যাননি। বাংলার গ্রামের ছোট ছেলেটি, সেই শংকরের এ্যাডভেঞ্চারের সখের মধ্যে প্রত্যেক বাঙালী ছেলের এ্যাডভেঞ্চারের নেশা মিটেছে।

লোকে বাঙালীকে বলে 'কুনো' জাত, 'কুঁড়ে' জাত।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা।

বাঙালী হয়ত জাগতিকার্থে ওয়ার্থলেস। টাকা রোজগার করতে জানে না, ব্যবসা বুদ্ধি নেই, ফন্দি ফিকির জাল-জালিয়াতিতে অপটু, কিন্তু বাঙালী স্বাধীনতা আনার সময় প্রমাণ করেছে যে, তারা ভারতীয় সব জাতের মধ্যে সবচেয়ে দাহ্য। আমাদের পুড়িয়ে ছারখার করে সেই আগুনের উষ্ণতাতেই হাত সেঁকছে অনেক অন্য প্রদেশীয়রা।

নকশাল আন্দোলন ঠিক বা বেঠিক সে কথা এখানে আলোচনার নয়, রাজনীতি আমার জ্ঞাত বিষয়ও নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় ছোট ছোট কয়েকটি দুবলা-পাতলা ছেলে, অপুষ্টিতে-ভোগা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মা-বাবার ঘরে অযত্নে লালিত সোনার টুকরো সব ছেলে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, সাম্প্রতিক অতীতে যে, সাহসের অভাব বাঙালীর কখনও ছিলো না। ছিলো না, মরতে কোনো ভয়।

জানো মহুয়া, আমি যখন ভাবি বাঙালীদের কথা, আমাদের কথা, আমার চোখে জল এসে যায়। এমন একটা জাতকে নেতৃত্ব দেবার মত নেতা নেই কোনো। বিধানবাবুর পর—সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কথা বলার মত নেতা একজনও হলো না। অবশ্য প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবুই বোধহয় বিধানবাবুর পর সবচেয়ে বড় বাঙালী নেতা। পোলিটিক্স এ-পার্ট। ইজম্‌, এপার্ট। যাঁদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে, তাঁদেরই নেতা বলি আমি।

পৃথিবীর অনেক দেশই ত ঘুরলাম—পাঁচ মহাদেশের চার মহাদেশ। শুধু অষ্ট্রেলিয়া বাকি আছে। যাব, কখনও। কিন্তু যতই নতুন নতুন দেশে যাচ্ছি, উন্নত এবং অনুন্নত—ততই আমার মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে। সেই বিশ্বাসটা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের মত দেশ নেই, আমাদের সাধারণ মানুষের মত মানুষ নেই।

শুধু নেতারাই যদি অমানুষ না হতেন। তাহলে এই সোনার দেশকে নিয়ে আমরা যে কি করতে পারতাম আর পারতাম না, তা আমরা ভাবতেও পারিনা।

আমার কি মনে হয় জানো? আমাদের দেশের উপযোগী, আমাদের দেশের জল-মাটি-হাওয়া—মানুষের উপযোগী একটা নতুন রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের দরকার। মাঝে মাঝে মনে হয়, চারদিক দেখেশুনে যে, সব ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন দল গড়ি। যে দল, সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয়—যে দল ক্যাপিটা-লিজম্ এবং সোস্যালিজম্ এর যা কিছু ভাল সেই সব কিছুকে গ্রহণ করবে, যে দল জনসংখ্যা হ্রাস এবং দারিদ্র্য-মোচনের সবরকম চেষ্টা করবে—। তাড়াতাড়ি দারিদ্র্য ঘোচাতে যদি দক্ষিণ পন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতে হয় তাই-ই করব—কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে। তারপর, যখন সব লোক মোটামুটি খেতে পরতে পাবে, মাথায় ছাদ পাবে, চিকিৎসা পাবে তখন একটা ফ্যাইন্যাল পলিসী ঠিক করে নিয়ে ফ্রান্সে-এর মত সোস্যালিস্ট হয়ে উঠব আমরা।

ভারতের মাটিতে যে বীজ বোনা যায় সেই বীজই বুনতে হবে আমদের। রাশিয়া থেকে বা আমেরিকা থেকে অথবা চীন থেকে মন্ত্র-বীজ আমদানী করে এনে এখানে পুঁতলে সেই গাছে ফুল-ফল ধরবে না। যে কারণে এত বছরেও ধরেনি। ক্যাপিটালিজম্ নয়, কম্যুনিজম্ নয়, এক নতুন ধরনের ওয়েলফেয়ারইজম্, বেসড্ অন পিওর ইণ্ডিয়ানিজম্, এর গোড়াপত্তন করতে হবে।

যাঁরা, বংশ পরম্পরায় ভারতের মালিক থাকতে চান, তাঁদের ঘৃণার সঙ্গে, শীতলতার সঙ্গে উপেক্ষা করতে হবে।

ভারী লজ্জা করে, যখন দেখি বাঙালীর মধ্যে এক ধরনের লোকেরাই সামন্ততন্ত্রকে সবচেয়ে বেশী প্রশ্রয় দিয়েছিল একটা সময়ে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন জজ সাহেব থেকে, প্রচণ্ড পণ্ডিত আইনজ্ঞ থেকে, ভারি ভারি সরকারী অফিসার কেউই বাদ যাননি পদলেহন করতে। ছিঃ ছিঃ। এই সব লোক বাঙালী জাতির কুলাঙ্গার। এমার্জেন্সীর পর যখন শাহ-কমিশনের রিপোর্ট ছাপা হচ্ছিল কাগজে রোজ, তখন আমার একবারও মনে হয়নি যে, ইন্দিরা গান্ধীর একটুও দোষ আছে। ইন্দিরা গান্ধীর বদলে যদি রাম, শ্যাম, যদু, মধু বা নিস্তারিনী, নেত্রমনি বা শৈলবালাও এসে দাঁড়ান এবং চাবুক হাতে সকলকে ভয় দেখান, তাহলে আমরা সকলেই ঠিক এই রকম মেরুদণ্ডহীন নপুংসকের মতই ব্যবহার করব।

নেতা আকাশ থেকে পড়ে না, জনগণের মধ্যে থেকেই

আসে। জনগণ যদি সারমেয়-শাবকের মতো হয়ে ওঠে; তাহলে তাদের নেতা ব্যাঘ্র-শাবক হবে কি করে?

তোমার মনে আছে? 'আয়নার সামনে' বলে একটি বড় গল্প লিখেছিলাম আমি এক সময় আনন্দবাজারের পূজা সংখ্যায়? সেই গল্পে ছিলো উত্তরপ্রদেশের জমিদার তনয় রাজিন্দর চারটে কালো এ্যালসেশিয়ান্ কুকুর পুষেছিল তার বাবার পরিত্যক্ত জলসা ঘরে। সেই কুকুরদের দেখাশোনা করত একজন থুর্‌থুরে সাদা দাড়ি-চুল-ওয়ালা বুড়ো—যার নাম "ঈজ্জৎ।"

কুকুর চারটির নাম ছিল মালিক, নোকর, আমীর এবং গরীব। রাজিন্দর এদের খাইয়ে ও উপবাসে রেখে, পারম্যুটেশান্ কম্বিনেশান করে এক্সপেরিমেন্ট্ করছিল কুকুরদের মধ্যে থেকে বাঘের মত চরিত্রর কোনো নেতা তৈরী করা যায় কী না!

ঐ গল্পের শেষে, রাজিন্দর তার কুকুর চারটেকে গুলি করে মেরে ফেলে, নিজেও আত্মহত্যা করেছিল। জলসা-ঘরের আয়নাতে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে লিখে গেছিল রাজিন্দর মৃত্যুর আগে, 'কুকুরের বাচ্চার নেতা কখনও বাঘের বাচ্চা হয় না।'

আসল কথাটাই এই। এই এ্যাডাল্ট-ফ্র্যঞ্চাইসের ধোঁকা, এই দু-নম্বর টাকার ভেল্‌কি নির্বাচনের সময়, এই ভণ্ডামি, অলসতা—বিবেকহীনতা, দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পর্যায়ে—এ জিনিস আমরা যদি মাথা পেতে সহ্য করে নিতে পারি—শুধু তাইই নয়, আমরা যদি সেই স্বৈরাচারিতাকে অথবা

অর্থহীন, অসার তথাকথিত গণতন্ত্রকে মদত দিতে পারি, তাহলে আর 'নেতা নেই,' 'নেতা নেই' বলে হাহাকার করে কি হবে ?

আমরা যেদিন নিজেদের আত্মসম্মান, মেরুদণ্ড, সৎসাহস ও নিঃস্বার্থতাতে ভূষিত করতে পারব, সেদিন নেতার মত নেতা, সুভাষ বোসের মত, সি-আর-দাশের মতো—এমনিতেই এসে উপস্থিত হবেন আমাদের নেতৃত্ব দিতে। বাঙলা দেশে কি আজ নেতৃত্ব দেবার লোক নেই ? নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু তাঁরা পাদপ্রদীপে নেই—কারণ তাঁরা জানেন, যারা তাঁদের পিছনে এসে দাঁড়ালে তবেই তাঁদের চলা শুরু হবে তারা এখনও যোগ্য করেনি নিজেদের। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইকনমিকস্-এর "গ্রেশাম্স ল" ইজ ইন টোটাল এ্যাপ্লিকেশান। "ব্যাড মানি ড্রাইভস্ এওয়ে গুড মানি।" ভালো লোকের স্থান খুবই কম বর্তমান রাজনীতির জগতে। সব জগতে।

স্বাধীনতার পর এত বছরে অনেক কলকারখানা হয়েছে। রাস্তা-ঘাট, ফোয়ারা, ফ্লাই-ওভার, পাতাল রেল সবই হয়েছে এবং হচ্ছে। মিগ ফ্যাক্টরী হয়েছে, অ্যাটম্ বোমা বানানো হয়েছে, কিন্তু—স্বাধীনতার সময় যে-ধাতুতে একজন গড়-পড়তা ভারতীয় গড়া ছিলেন, সেই ধাতুতেই এখন ভেজাল ঢুকে গেছে। সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে গেছে। সব জিনিসের মধ্যে যে জিনিস সবচেয়ে দামী—যা human element—সেই human element-এই গলদ ঢুকে গেছে সবচেয়ে বেশী।

মানুষ মনুষ্যত্বরহিত হয়ে যাচ্ছে, মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে, শুধুই

নিজের সুখ, নিজের টাকা, যেন-তেন-প্রকারেন—বড়লোক হব, ভালো থাকব, ভালো খাব—গদিতে আসীন থাকব এই উচ্চাকাঙ্খার ফুটো-তরী বেয়ে আমরা উন্নতির পারে পৌঁছতে চাইছি। এভাবে, কখনও স্থায়ী কিছু পাবার নয়।

তুমি অন্য যে-কোনো দেশের ইতিহাস দেখো। স্বাধীনতা পেতে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে তারা কত দাম দিয়েছে। যে দেশ শুধু পরের মাথায় টুপি পরিয়ে উচ্চমন্যতায় ভুগেছে, সেই আমেরিকাই দাম দেয় নি গত দুশ বছরের মধ্যে তেমন করে তার স্বাধীনতার। তাই-ই তারা সব সময় যুদ্ধং-দেহি। এমন অর্বাচীনতা এবং অপরিণাম-দর্শীতা কেবল তাদেরই মানায়। অথচ আমেরিকায় গিয়ে দেখেছি, একজন সাধারণ গড়পড়তা মানুষ কত ভাল! ওদেরও পুরোপুরি ডোবালো ওদের নেতারা, আর্মস্ ডিলাররা আর ওদের হাস্যাস্পদ ফরেন-পলিসী।

ওরা চিরদিন সবদেশে কাগুজে লোকদের, ভুল লোকদের উপরে জ্যাকপট খেলল। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারল। অ-কবি কালিদাসের পর, যে-ডালে আসীন সে-ডালেই কুড়ুল মারার মত এত বোকা রাষ্ট্রনীতি অ্যামেরিকানদের মত বোধ হয় আর কখনও কেউ দেখে নি।

কোনোদিন নিজের দেশের মাটিতে যুদ্ধ হলে অথবা তেমন করে দাম দিলে ; তবেই আমেরিকান স্বার্থদুষ্ট নেতাদের ট্রিগার-হ্যাপিনেস্ কমবে।

আমাদের অবস্থাও ত আমেরিকারই মত। তবে অন্য রকম। বাঙলায় আর পাঞ্জাবে গুলি চালিয়ে আর গুলি খেয়ে ছেলেরা মরল ইংরেজ তাড়াতে গিয়ে। যারা মরল, তাদের কোনো কথা রইলনা তেমন করে ইতিহাসে—ইতিহাস বলল : চরকা কেটে আর ছাগলের দুধ খেয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

ছাগলের দুধ খেয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, সেই স্বাধীনতা এর চেয়ে ভালো আর কি হবে। কি হতে পারে?

জানো ছুটি, শিলিগুড়ি থেকে নেপালের বর্ডারে ধুলাবাড়ি বলে একটা জায়গায় গেছিলাম—নেপালের 'ঝাপা' ডিস্ট্রিক্টে। সেখানে দেখলাম মাড়োয়ারী ব্যবসাদারেরা নানা ইম্পোর্টের্ড গুডস্-এর ব্যবসা করে। কাঠমাণ্ডু থেকে নানা রকম জিনিস আসে সে দেশে। আমি বল-পয়েন্ট পেন কিনেছিলাম তিরিশ টাকা দিয়ে। ঐ সব দোকানে দেখলাম পূর্ব বাংলার ভাষায় কথা-বলা, অতি গরীব বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তু মেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে।

ওরা কারা, তা জিগগেস করতেই জানলাম যে, ওরা মাল-বাহক। কেউ যদি নেপালে এক লক্ষ টাকার বিদেশী জিনিসও পছন্দ করে আসে, তা হলে ক'দিন পরে সে ভারতীয় এলাকার মধ্যে ঐ জিনিসগুলো পেয়ে যাবে—বারো পারসেন্ট লাগবে ক্যারীং চার্জ। সীমান্ত পার করা এবং ক্রেতার কাছে মাল পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দোকানদারের।

এই মেয়েরা কত পয়সা পায় কে জানে? তার বদলে, তাদের

অশেষ শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াও দুই সীমান্তের প্রহরী-পুরুষের কাছে যা সবচেয়ে স্বাদু এমন কিছু নারী-সুলভ জিনিসও তুলে দিতে হয় বিনি-পয়সায়।

সারা দেশে ইম্পোর্টেড জিনিসের ছড়াছড়ি। ফুটপাতে দোকানে সব জায়গায় বিক্রী হচ্ছে—তাতে কিছু হয় না—আমি তিরিশ টাকার বল-পয়েণ্ট পেন কেনাতে তা নিয়ে কি টানাটানি, জবাব দিহি। দুই সীমান্তেই। ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা চলেছে দেশে। একেবারে পরাকাষ্ঠা।

আর ঐ বাঙালী মেয়েরা?

দেশ ভাগ করে ছিল কারা? গান্ধীজী—পণ্ডিতজী আর জিন্না সাহেব। বাঙলার লোকদের এবং পাঞ্জাব-সিন্ধের লোকদের ত মত নেওয়া হয় নি। এই স্বাধীনতা বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছিল। সেই অভিশপ্ত জীবন আজও বইছে বাঙালী, বইবে আরও অনেক দিন, বইতে হবে বাঙালীকে অন্য প্রদেশীয়দের হাসির খোরাক হয়ে। আমার জাতের, আমার মাতৃভাষায় কথা বলা মেয়েদের, বোনেদের দুটি ভাতের জন্যে এই অপমান, অসম্মান চোখেও দেখা যায় না।

মহুয়া, সকলে যে ভাবে না, সকলের যে লাগে না, দেশকে সকলে যে ভালোবাসে না। দুঃখের কথা এই-ই যে, সকলেই নিজ-স্বার্থচিন্তাতে এতই ব্যস্ত; টাকা রোজগার করতে, গদি সামলাতে; যশ আগলাতে, বাই হুক্ অর বাই ক্রুক্ যা বিনা

যোগ্যতায় পাওয়া তা বজায় রাখতে দেশের বা দশের কথা ভাবার সময় কার আছে ?

পদ্মা, আমরা পুরো জাতটাই মেরুদণ্ডহীন, আত্মবিস্মৃত, ভীরু হয়ে গেছি। যদি মূল্যই না দেওয়া যায়, তাহলে কি মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় ?

ভয় ?

ভয় মানে অজ্ঞানতা।

যার বুকে ভয় আছে, ভয় থাকে, কোনো কিছুর ভয়, জুজুর ভয়, ভূতের ভয়, জেল খাটার ভয়, অত্যাচারিত হবার ভয়, অপহৃত হবার ভয়, সে মানুষ-পদবাচ্য নয়। ভীরু জানোয়ারের মত, মাথা নীচু, ঘাড় নীচু করে বেঁচে আছি আমরা নিজেরই দেশে। কিন্তু কেন ?

কেবলই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায় মহুয়া, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

আমরা যে নিরন্তর অন্যায় করছি, এবং অন্যায় সইছি। কই ? আমাদের ত একটু কিছুও পোড়ে না। বেশ ত আছি। ফারষ্ট ক্লাস।

ছিঃ ছিঃ। লজ্জা বড় লজ্জা, মহুয়া।

তোমার বুদ্ধদেবদা

প্রিন্স হোটেল
হাজারীবাগ

মহুয়া,

আনন্দবাজারে খবরটা নিশ্চয়ই দেখেছো যে, হাজারীবাগে মানুষখেকো লেপার্ড বেরিয়েছে এবং আমি মারতে যাচ্ছি।

নাও পড়ে থাকতে পারো, কারণ তোমার স্বামী ত আনন্দবাজার রাখা বন্ধ করে দিয়েছে। বদলে, সত্যযুগ রাখছে। 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' 'আজকাল' সবই নাকি বুর্জোয়াদের কাগজ। তাই-ই নিজে পরম-বুর্জোয়া হয়েও বাড়িতে একমাত্র সত্যযুগ রেখে সে প্রমাণ করতে চাইছে যে সে প্রলেতারিয়েত্।

এদেশে সবই মানিয়ে যায়। নেতারাই যখন ভণ্ডামির প্রতিযোগিতাতে গোল্ড-মেডালিস্ট একেকজন, তখন তোমার স্বামীর মত সাধারণ একজন সুযোগ-সন্ধানীকে দোষ দিই কেন?

আসল কারণটা কি জানো? আনন্দবাজারে আমার লেখা বেরোয় যে! যুগান্তরে বা কি আজকালেও বেরোতে পারে। কিন্তু সত্যযুগে হয়ত বেরুবে না—কারণ কখনও তাঁরা লিখতে বলেননি, একথা আর কেউ না-জানুক ধূর্তচূড়ামণি কিন্তু মূর্খের-ভেকধারী তোমার স্বামী বিলক্ষণ জানে।

পাছে আমার লেখা পড়ে আমার কথা তোমার মনে পড়ে যায়, পাছে তুমি আমাকে হঠাৎ ফোন করে বসো, পাছে দেখা

করো, অথবা আদর করো, সেই-ভয়ে তোমার স্বামী সবসময় সিঁটিয়ে থাকে। সম্মুখ সমরে সে চিরদিনই হারবে আমার কাছে—সবদিকে। আমার সঙ্গে কোনো ভাবে কোনো প্রতিযোগিতাতে নামারই যোগ্যতা নেই তার। তাই ত সে চোরা-গোপ্তা ছুরি চালায়, ছলে বলে কৌশলে। ছোট্ট-সুখের ধূর্তমুখের ক্ষুদ্রমনেব সংকীর্ণ-বাসার ও চড়াই পাখি। আর আমি বাজ। চড়াই পাখির মত সে ছোট ছোট ইতর-হানা হানে আমার বুকে, বিষের ঠোঁটে। কিন্তু ও জানেনা যে, আমি বাজ। ছোঁ মেরে নিতে চাইলে, তোমাকে এক ছোঁতেই উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম নিরুদ্দেশ আকাশে—আমার উষ্ণ লোমে-ঢাকা বুকে তোমার ভয় পাওয়া ধুকপুক বুক আশ্রয় পেত। চিরদিনের মত। কিন্তু বাজ বলেই, চড়াই পাখির ঘর ভাঙার ইচ্ছা নেই আমার I am not the least intersted in any episode of sparrows। তার সুখ তারই থাক। তার স্ত্রীও তার।

একজন পুরুষ একজন নারী, তাদের সামাজিক স্থিতাবস্থাতে বাঘবন্দীর ঘরের গুটি হিসেবে তাদের নিজ নিজ যাথর্থ প্রমাণ করেও অন্যকে অনেক কিছু দিতে পারে, নিতে পারে অন্যের কাছ থেকে যে, এ কথাটা বোঝার মত উদারতা বা বুদ্ধি তোমার স্বামীর নেই। হবেও না কোনোদিন। তাই সে সবসময়ই ভয়ে মরে, উৎকণ্ঠায় সিঁটিয়ে কি করে আমার কোন্ সর্বনাশ করবে এই মতলবে থাকে। তার সংসারের নিশ্চিন্ত আবর্তে আবর্তিত হয়ে —কাজ—খাওয়া—রমণ—ঘুম—কাজ—খাওয়া —রমণ— ঘুমে

লেপ্‌টে থাকতে চায় লেজে-গোবরে হয়ে, ফসল—ন্যাড়া মাঠের একলা লোলচর্ম, রোমহীন ষাঁড়ের মত।

থাকুক।

ওর মনে বিঘ্ন না ঘটিয়েও আমি আমার যা পাওয়ার তা পেতে পারি, পেয়েছি। এবং পাব। সে কথা ও যেমন জানে, তুমিও জানো। তুমি কিন্তু ওর প্রতি যত ভালো, আমার প্রতিও ততই ভালো হতে পারতে। তুমি ওর সন্তানের জননী বলেই যে, ওর প্রতি বেশী বিশ্বস্ত হতে হবে এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ বা যুক্তি আমি অন্তত দেখতে পাই না।

এক বিশেষ রাতে ওর আদর না-খেয়ে আমার আদর খেলেও ত তুমি ওর সন্তান না বয়ে আমার সন্তান বইতে পারতে গর্ভে। যদি ভালোবাসা না থাকে তেমন, যদি প্রেম বা সম্মান না-থাকে সম্পূর্ণ, তাহলে কে কার গর্ভে কোন্ বীজ রোপণ করল তাতে কার কি এসে যায়?

তুমিও দারুণ ভণ্ড। হয়ত মেয়ে মাত্রেই ভণ্ড, প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী তোমরা, জন্মাবধি, মঞ্চে বা পর্দায় না-নেমেও। তুমি আবার কুসংস্কারাচ্ছন্নও। তুমি আমার সঙ্গে আশ্লেষে অঙ্গাঙ্গী হয়ে পরমানন্দের চাপা, উষ্ণ, মনোসীলেবেলে্র হঠাৎ, অনিচ্ছাকৃত প্রকাশে আমার প্রেমিকা হতে পারো—আনন্দে, আবেশে, শিউরে শিউরে উঠতে পারো, কালনাগের আলিঙ্গনাবদ্ধা কালনাগিনীর মত; কিন্তু তবু, আমার সন্তানের মা হতে পারো না!

জয় ভগু রাজের জয়! জয় ভগু রাজ্যের জয়।

শিকার ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন। ভালো লাগেনা। একটা বয়স বোধহয় থাকে, বাহাদুরী-প্রবণতার। সেই বয়সটা পেরিয়ে এলে এবং বাহাদুরী যাদের কাছ থেকে প্রাপ্য ছিল আমার, সেই লোকেদের অনুপস্থিতির ফলে, বাহাদুরী-প্রবনতাটাও দিনশেষের রোদের মতই নিঃশব্দে মরে যায়।

কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি! খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল বুদ্ধদেব গুহ হাজারীবাগে মানুষখেকো মারতে যাচ্ছেন। এখন ত না গেলে ইজ্জত থাকে না! অন্তত বর্ধমান অবধি যাওয়া বিশেষই দরকার। সোমবার সকালে, গোপালকে আমি ফোন করেছিলাম অন্য লোকের মুখে শুনে।

ও বলল, হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। আমার নামেই পারমিট। ম্যানইটিং লেপার্ড্! তুমি চলে এসো। কিন্তু গোপালের যে, হাজারীবাগী-তিড়িবাজীর অভ্যেসটি এখনও যায়নি ; তা আমার জানা ছিলো না।

যাব, এই কথা আমার কাছ থেকে শুনে পার্থ বসু টুকরো খবরে এক সোমবার এ খবর প্রচার করে দিলেন। তারপরই কেলেঙ্কারী। টেলিফোন, চিঠি ; সমূহ সর্বনাশ!

কাল অফিসের পর কোলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে বেরুলাম ছ'টা নাগাদ। সঙ্গে এ-বি কাকু। জি-টি-রোড-এর অবস্থা যে এমন হয়েছে, জানা ছিলো না। বর্ধমান পৌঁছতেই রাত দশটা হয়ে গেল। বর্ধমানের পর পথের ধাবাতে রুটি-তড়কা দিয়ে

ডিনার সারলাম। ধাবার মালিক সর্দারজী শুধোলেন, "বীর" পীজিয়েগা সাব? প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভীরু লোকেরা, আমার মত, বীর কথাটি শুনতেও ভয় পায়। তারপর তিনি বললেন, বিলকুল্ ঠাণ্ডা হ্যায়। তখন বুঝলাম "বীয়ার"। কি ব্র্যাণ্ড? বললেন, "গুরু"। • ভাবলাম, গুরুগিরিতে পোক্ত হওয়া যাবে হয়ত খেলে। কিন্তু না খেলেই ভাল হত। ঐ গুরুর চেলা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। গুরুরাই ঐ বিশেষ "গুরু"-ভক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

বর্ধমান থেকে রাত এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে আসানসোলে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত আড়াইটে। একটা নতুন হোটেল করেছে। এয়ার-কণ্ডিশানড। জি-টি রোডের উপরেই। সেখানেই তিনচার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবো বলে ভাবলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল, গুমোট দমবন্ধ গরম, রাতের বেলাও।

পথে অনেকেই বলছিল যে, আজকাল রাতে জি-টি রোডে যাতায়াত করা ঠিক নয় গাড়িতে। আমি ত বেঠিকের কিছু দেখলাম না। অবশ্য বেঠিক হলেও হয়ত ঠিক হয়ে যেত, কারণ এ-বি কাকু এবং আমার দুজনেরই কোমরে যার যার পিস্তল বাঁধা ছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল রবি, তাই প্রয়োজন ঘটলে মোকাবিলার জন্যে দু হাতই মুক্ত ছিল। অবশ্য, আজকাল পিস্তল কোনো অস্ত্রই নয় প্রতিরক্ষার।

যাই হোক, আজ ভোরে উঠেই তৈরী হয়ে সাতটার মধ্যে

বেরিয়ে পড়েছিলাম। বরাকরের সংকীর্ণ ব্রিজে লরি উল্টে রয়েছে। অতএব প্রধানতম জাতীয় সড়ক বন্ধ। শ'য়ে শ'য়ে লরি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত ইম্পট্যানট রাস্তার এত ইম্প´ট্যানট একটা ব্রিজকে যে, কেন চওড়া করেন না কর্তৃপক্ষ এঁরাই জানেন।

তেমনই আর একটা ব্রিজ বর্ধমানের আগের মুনিয়া ব্রিজ। যাই হোক, দেশের ভাবনা ভাবার জন্যে এত সব হোল্-টাইম তালেবর তালেবর প্রফেশানাল লোক থাকতে আমার মত অর্বাচীনের এসব ভাবনা না ভাবাই ভাল। শুধু মনে হয় যে, সহ্যশক্তি আমাদের অসীম। কানে ধরে সবরকম খাজনা চোখ-রাঙিয়ে আদায় করতে সরকার প্রচণ্ড দড়, তার বদলে কাউকেই কিছু দিতে নারাজ। যারা ট্যাক্স দেয় সবরকম, তাদের বলা হয় জনগনের সেবার জন্যেই তা আদায় করা হচ্ছে। ট্যাক্সের টাকা সাত ভূতে মিলে ছয়লাপ করে। জনগণও যে-তিমিরে, সেই তিমিরেই। যে-কোন দেশেই পাবলিক এক্সপেণ্ডিচারের ক্ষেত্রে সুদৃষ্টান্ত স্থাপন না করতে পারলে, পাবলিক ইনকামের বা তা বাড়ানোর কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না। এই রঙ্গই চলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকেই।

মাইথন হয়ে ঘুরে আবার জিটি রোডে পড়ে বাগোদর, বিষেণপুর এবং টাটীঝারীয়া, কোর্‌রা হয়ে যখন হাজারীবাগ পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল। কথা ছিল, গোপালের বাড়িতেই

উঠব, কিন্তু সঙ্গে এ-বি কাকু থাকায় প্রিন্স্ হোটেলেই গেলাম প্রথমে। হোটেলের মুখেই সাউথ-ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের এক-দলের সঙ্গে দেখা। সাধনদা পালের গোদা। জীপে করে ফিরছেন ওঁরা সবে, সারা দিনের বীটিং শিকার সেরে। কাল ঝাল্দা থেকে এসেছিলেন জীপ নিয়ে। আজই আবার ফিরে যাবেন। গোপাল, সাধনদা এণ্ড কোম্পানী, ঝরিয়ার বদি বাবু (বদ্যিনাথ রায়) সকলেই বীটিংএ গেছিলেন শুনলাম। এখন বদিবাবু হাজারী-বাগেই সেট্ল্ করেছেন। বদিবাবুর ছেলেরাও বীটে গেছিলেন।

সাধনদার মুখেই শুনলাম যে, জন্তুটি লেপার্ড মোটেই নয়। নেকড়ে বাঘ। বিহারে যাকে বলে, "হুণ্ডার।" একদল।

খুবই মন খারাপ হয়ে গেলো। প্রথমত জন্তু লেপার্ড নয়, হুণ্ডার বলে। দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যেই এত শিকারির সমন্বয় ঘটেছে বলে। এবং শিকারি তাঁরা, কেউই আমার চেয়ে ভাল ছাড়া, খারাপ নন।

গোপালের উপর রাগও হলো খুব। সন্ধ্যেবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে বুঝলাম যে, ব্যাপারটা ও জানত। বহুদিন আমি হাজারীবাগে যাইনি বলে ও নাকি বন্ধুকে ট্রিক্ করে আনিয়ে-ছিলো। আমি টোটালী ডিস্অ্যাপয়েন্টেড্ এবং ফ্রাস্ট্রেটেড্ হলাম। এই গরমে এতখানি গাড়ী চালিয়ে এত টাকা পয়সা খরচ করে আসাই বৃথা হল। বন্ধু যে আমাকে ভালোবাসে এবং আমার সঙ্গ চায় এ জেনে ভাল লাগল যেমন, তেমন রাগও হল।

নেকড়েরা ছোট ছোট দলে থাকে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে এত ব্যস্ততার মধ্যে নেকড়ে মারার জন্যে এখানে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। গোপাল বলল, বর্‌হি রোডের বাঁ পাশে, পদ্মার রাজার বাড়ির অনেক আগে কতগুলো নালা আছে সেখানে নাকি মর্গ থেকে বেওয়ারিশ সব মৃতদেহ ফেলা হত। কয়েকটি নেকড়ে মড়া খেয়ে খেয়ে মানুষখেকো হয়ে যায়। তারপর হাজারীবাগ—বর্‌হি রোডের দুপাশের গ্রাম থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধরা আরম্ভ করে। দু একজন বুড়িকেও নাকি ধরে। সবশুদ্ধ ন'জনকে ধরার খবর ছিল তখন। ন'জনকে ধরার পরই ডি এফ-ও ও ডি-এম ম্যানইটার ডিক্লেয়ার করে, পারমিট দেন।

যাই হোক্, পরদিন বদিবাবুর ছেলে ও গোপালের সঙ্গে হাজারীবাগের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টাব মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতি সুন্দর ও সুন্দরী—প্রবাসী বাঙালী। কমবয়সী। দুঃখ হল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে। কি করে নেকড়ে নিধন করা যায় সেই নিয়ে সকলে মিলে আলাপ আলোচনা করলেন ওঁরা।

গোপালের হাজারিবাগেই একটি সুন্দর বাড়ি আছে। বর্‌হি রোডে। হাজারীবাগেই অফিসের ব্রাঞ্চ পর্যন্ত খুলে বসেছে ও। ওর পক্ষে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে ওখানে নেকড়েদের মোকাবিলা করা অনেক সহজ।

ক্কোস্‌মাতে গিয়ে পিকনিক হলো অনেকদিন পর। খুব ভালো লাগল আশোয়া, আশোয়ার পরিবার, কাড়ুয়ার বেটা রত্না, রত্নার বৌ সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে পুরোনোদিনের অখণ্ড অবসর ও ছেলেমানুষি, অনাবিল আনন্দের স্মৃতিভরা দিনগুলি চকিতে ফিরে এল মনে। সে সব দিন আর ফিরবে না। কাড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হলো না।

নাজিমসাহেবের পাঠানো বাখরখানি-রোটি, কাবাব এবং জয়শ্রীর তত্ত্বাবধানের ফারস্ট ক্লাস খিচুড়ি এবং নানারকম ভাজা-ভুজি এবং তার সঙ্গে পিস্তল প্যাক্‌টিস—গাছের ডালে বীয়ারের বোতল ঝুলিয়ে রেখে। সেদিনই রাতে, যে-অঞ্চলে নেকড়েরা বাচ্চা ধরছে, সেই দিকে ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরি করলাম আমি, গোপাল আর বিশু। কিন্তু কটি শিয়াল এবং একটি বনবিড়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

কাল ভোর বেলা এখান থেকে বেরুব। জি-টি রোড এর যা অবস্থা, জি-টি রোড দিয়ে যাব না। রাঁচী হয়ে হাইওয়ে ধরে বহড়াগড়া খড়্গপুর, হয়ে ফিরে যাব কোলকাতা।

হাজারীবাগ-বৃত্তান্ত—আপাততঃ শেষ হলো।

খবরটা কাগজে বেরুনোর পর তুমি ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলে, তাই তোমাকে সবিস্তারে জানালাম।

গোপাল নিশ্চয়ই কয়েকটি নেকড়ে মারবে—সবগুলো না মারতে পারলেও। টুটু ইমামের ছেলে বুলু ইমামের চিঠি দেখলাম গোপালের কাছে—তার মতে, যে-জন্তুটি বাচ্চা ধরছে,

তা নাকি ক্যানারীহিলের একটি লেপার্ড। নেকড়ে নয়।

শিকারিদের মধ্যেও অনেক রেষারেষী, মন-কষাকষি, ও রাজনীতি চলে। চলাই স্বাভাবিক। শিকারীরাও মানুষ। অথচ স্পোর্টস্ এ এই ঘৃণীত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলে কতই না ভাল হত!

ভালো-মানুষী, সরলতা, সহৃদয়তা ক্রমশঃ এই পৃথিবীতে এবং সবিশেষ এই দেশে, মূর্খামি বলে চিহ্নিত হচ্ছে।

এটা বড় ব্যথার, দুঃখের ; লজ্জার।

ভালো থেকো।

তোমার বুদ্ধদেবদা

পূর্ণাকোট
অংগুল সাবডিভিসান
ওড়িশা

মহুয়া,

কটকে এসেছিলাম মাঝে, ভুবনেশ্বরে কাজ সেরে। একসঙ্গে তিনদিন ছুটি পড়ে গেলো শনি, রবি নিয়ে। অনেকদিন আসিনি এদিকে, তাই চলে এলাম।

টিটাগড় পেপার মিলের টিকড়পাড়ার বাংলোতে থাকতে পারতাম। দ্বারিকদা, ঘোষ সাহেবকে (কনক ঘোষ) বলেছিল। মহানদীর পাশে টিটাগড় পেপার মিলের খুব সুন্দর বাংলো আছে একটি। ছবির মত। কিন্তু যখন আসার ইচ্ছে ছিল তখন আসা হলো না। যাই-ই হোক, টিকড়পাড়ায় তেমন জঙ্গল নেই আর এখন। যদিও মহানদী আছে। সরি, নদ।

যত সুন্দর সব নদী, সবই কিন্তু নদ—। অন্ততঃ আমার যা দেখা। সুন্দর মানে ব্যক্তিত্যসম্পন্ন নদী। ওড়িশার মহানদী, আসামের ব্রহ্মপুত্র আর আমাদের তিস্তা।

এই পূর্ণাকোট জায়গাটি আমার বিশেষই প্রিয়। আমার নানা লেখাতে এই পূর্ণাকোট এবং এর আশেপাশের নানা অঞ্চলের কথা আছে। তখন আমার শরীরে-মনে ভরা জোয়ার। যা কিছু দেখতাম তখন তাই-ই ভালো লাগত, যে সুন্দরী মেয়ে

দেখতাম তাকেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করত ; এবং ভালবাসতে চাইলে তারাও ভাল না-বেসে থাকত না। সেই সব ভিনি-ভিডি-ভিসির দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। জীবনের নৌকো এখন নদীর ঘাটে, বটের ছায়ায় বাঁধা। যদিও একটি মাত্র ঘাটেই যে "বাঁধা" এমন মিথ্যে কথা বলব না। এখন পাটাতনে শুয়ে, নৌকোর কোলে স্নিগ্ধ শীতল জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে স্মৃতিচারণ করতে ভালো লাগে। বুকের রক্তও আর আগের মত ছলাৎ-ছলাৎ করে না সবসময়, ধমনীতে রক্তের দ্রুত দৌড়োদৌড়ির দিন শেষ। তবু, এখন যে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছে মানুষটা একথা বলব না, এখনও ভালোবাসে ভালোবাসার মত কাউকে দেখলে। তবে, চোখ বড়ই বদলে গেছে। খুব কম মানুষকেই মনে ধরে। মনে ধরলে, ভয় করে ; যদি সে···

শীতের শিমূলের মত পাতাঝরা, রুক্ষ, উদাসী হয়ে গেছি এখন। কিছুতেই ভালো লাগে না, কাউকেই ভাল লাগে না ; বড় বিপদ। মস্ত ভরসা এইই যে, তোমাকে এখনও ভালো লাগে।

কটক থেকে ঢেন্‌কানল হয়ে অংগুল হয়ে যে পথটি চলে গেছে টিকড়পাড়া অবধি, সেই পথেই এ পূর্ণাকোট। পূর্ণা-কোটের একটু আগে ডানহাতে একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে বাঘমুণ্ডা। বন-বাংলোর দিকে। বাঘমুণ্ডা আমার "নগ্ন-নির্জন" উপন্যাসের পটভূমি।

পূর্ণাকোট থেকে বাঁ দিকে একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে—টুল্বকা বন-বাংলোয়। টুল্বকা বন-বাংলো "কুচিলা-খাঁই" এবং অন্য নানা গল্পের পটভূমি। ভীমধারার জলপ্রপাত। সীন্থিয়া জোন্স এবং তার দুঃখের কথা আছে কুচিলা-খাঁই গল্পে। পূর্ণাকোট থেকে একটি রাস্তা সোজা চলে গেছে ডানদিকে এবং সেই রাস্তাতেও গিয়ে পৌঁছনো যায় বাঘ্‌মুণ্ডা বাংলোতে। এই রাস্তায় কূপ-কাটা ক্যাম্প এবং পূর্ণাকোট—টিকরপাড়ার পথেব তৈলা—"জঙ্গলের জার্নাল" উপন্যাসের পটভূমি। অংগুল থেকে পূর্ণাকোটে আসবার পথে করতপটা বলে একটি ঘুমন্ত গ্রাম পড়ে। তারই আগে পানমৌরী আর সর্পরসের দোকান। সর্প একরকমের গাছ, অনেকটা আমাদের তাল গাছের মত দেখতে—সেই গাছের রস থেকে প্রচণ্ড কড়া একরকমের মদ তৈরী হয়। তোমার ঠোঁটের মত মাদকতা তাতে।

একবার জীপ থামিয়ে, এই দোকানে পানমৌরী কিনতে নেমেছে কটকের কটকচণ্ডী রোড়ের ফুটুদাদের দুর্গা মুহুরী। আমি জীপের স্টিয়ারিং-এ বসে পাইপ খাঁচ্ছি। হঠাৎ দেখি, একটা লোক মাতাল হয়ে, পানমৌরীর বোতল বগলদাবা করে গান গাইছে "আলো, শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।"

এই লাইনটি দর্শনশাস্ত্রের অতি গভীর বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিল আমার তাৎক্ষণিক মনে। ওড়িয়াভাষাতে ঐ লাইনটির মানে হল, "ওরে শুকনো কচু, তোর মন মরে গেলো দ্বিপ্রহরে"। গায়ক নিজেকেই নিজে শুকনো কচু বলে ভাবছে

আর বলছে, হায় হায়, তোর মন মরে গেলো দুপুরবেলায়। এই ভরদুপুরে হায়রে হায়, আমাদের অনেকেরই মন মরে। মন-মরা থাকি অনেকই সময়। কিন্তু মনের মরার মুহূর্তটিকে এমন সামান্য কথায় অসামান্যভাবে প্রকাশ করা সহজ কথা নয়।

আরও একদিনের কথা মনে পড়ে। সেবারে কটক থেকে জঙ্গলে আসতে রাত হয়ে গেছিল। জঙ্গলের মধ্যে জীপ থামিয়ে বনেটের উপর হুইস্কীর গ্লাস রেখে আমরা হুইস্কী খাচ্ছি। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শিরশিরে বাতাস বইছে জঙ্গলের বুকের মিশ্রগন্ধ বয়ে। জঙ্গলের মধ্যে জোনাকিরা নীলচে আলোর স্পন্দিত বিন্দু দিয়ে আলোর আলপনা আঁকছে ভিজে, সুগন্ধ অন্ধকারে।

বর্ষার বনের বৃষ্টিভেজা গায়ের এক আশ্চর্য নিজস্ব গন্ধ আছে। ক্যামে সাবান মেখে তুমি চান করে বেরোবার পরই তোমার স্তনসন্ধিতে নাক রাখলে, যে সুগন্ধে আমি বুঁদ হয়ে যাই, সেই গন্ধ, তার চেয়েও মিষ্টি ও মাতাল-করা।

তুমি ছাড়াও হাজার নারীর ভালোবাসা পেয়ে ধন্য বোধ করেছি এ জীবনে, আজীবন কৃতজ্ঞ থেকোছ এবং থাকব ; কিন্তু প্রকৃতির মত এত ভালো আর কোনো নারীকেই বাসতে পারিনি। এবং পারবোও না।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চার ধার থেকে—শম্বরের ঢাংক্ ঢাংক্ ডাক ভেসে আসছে নীচের খাদ থেকে—নিশ্চয়ই বড় বাঘ রোঁদে বেরিয়েছে। ঠিক এমন সময় মেয়েলী গলায় গান গাইতে গাইতে

একটি বাচ্চা ছেলে ঐ শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের পথে পূর্ণাকোটের দিক থেকে হেঁটে আসছিলো। গানটির কথা ছিল "ওরে মোর সজনী, ছাড়ি গল্বা গুণমনি ; কা কর ধরিবি ?" মানে হচ্ছে, ও মোর প্রিয়া, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে ; এখন আমি কার হাতে হাত রাখব ?

"বন্ধু, রহো রহো সাথে, কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো, হাতে"—গানখানি কোনো নিস্তব্ধ বৃষ্টিভেজা রাতে নীলিমা সেনের গলায় শুনলে বুকের মধ্যে যে এক তীব্র কষ্ট উঠে এসে শ্বাসরোধ করে ফেলে, এই ছেলেটির গানের কথায় এবং গায়কীতে তেমনই কিছু ছিল।

এই গানটি "পারিধী" উপন্যাসে একটি বিশেষ চরিত্রে—বলরামের চরিত্রে—এবং এক বিশেষ ব্যঞ্জনাতে ব্যবহার করেছি। "পারিধী" কথাটি একটি খন্দ্ উপজাতীয় শব্দ। অর্থ মৃগয়া। অনেক বইয়ের দোকানে পাঠকেরা শুধিয়েছেন, বুদ্ধদেব বাবু কি "পরিধি" বানানটাও জানেন না ? আমি নিতান্ত মূর্খ যে, একথা কখনও অস্বীকার করিনা, কিন্তু এতবড় মূর্খ বলে মনে করলে পরম মূর্খরও দুঃখ হয়। এই নামের জন্যই অনেক পাঠক এই পড়ার আনন্দ থেকে নিজেদের ইচ্ছাকৃতভাবে নিবৃত্ত করেছেন।

নিজের মনে ভাবলে, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে, একটুকরো কথা, এক কলি গান, এক ঝলক দেখা, এক চিল্‌তে হাসি, মুহূর্তের বাঙ্ময় নীরবতা সব, কেমন অবচেতনের অশেষ

শক্তিশালী কমপ্যুটারে বিধৃত থাকে, আর ঠিক সময় মত কেমন দৌড়ে আসে কলমের মুখে !

পূর্ণাকোটে পৌঁছোবার বেশ কিছু আগে, করতপটার পর একটি রাস্তা চলে গেছে বাঁয়ে। সেই রাস্তা পৌঁছেছে গিয়ে লবঙ্গীতে। চমৎকার ছবির মত খড়ের চালের বন-বাংলো। টিলার মাথায়। চারপাশে নিঃশ্ছিদ্র ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এখানের জঙ্গলের নিশ্ছিদ্রতা এমনই যে, মনে হয় সুন্দরবনের বা অন্য কোনো ম্যাংগ্রোভ্ বনের জঙ্গল বুঝি। এই লবঙ্গীর পটভূমিতে লেখা আমার "লবঙ্গীর জঙ্গলে"। "পারিধী" উপন্যাসের উত্তরস্মূরী ; দ্বিতীয় খণ্ড।

এখন রাত। পূর্ণাকোটের পথের ওপর যে পুরোনো কাঠের বাংলো, আমি সেই বাংলোতে উঠেছি। আরও একটি পাকা বাংলো হয়েছে জঙ্গলের ভিতরে, টিলার মধ্যে ; সেখানটাতে বড় দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে আমার। হানিমুন কটেজের মত কৌটো-বন্ধ বাংলোটা। তাই-ই সেখানে থাকিনি। তুমি যদি কখনও একা আমার সঙ্গে জঙ্গলে আসতে, তাহলে ঐ বাংলোতেই উঠতাম। আমাদের কেউই দেখতে পেতো না। কত গল্প করতাম, কত চুপ করে থাকতাম ; বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখা কত অপূর্ব ঝুমঝুমি শব্দের সঙ্গে কত দেখতাম একে অন্যকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নিভৃত, পাখি-ডাকা বনগন্ধের নিবিড় নির্জনে। ভাব ভাব কদমের ফুলের মত ভাব হত তোমার আমার সঙ্গে। কী গভীর আনন্দ !

থাক্। যে স্বপ্ন সত্যি হয়নি, হবেনা কখনও, তাকে মনে মনে বেশী নাড়াচাড়া করলে, তেতো হয়ে যায় তা। স্বপ্নও লেবুরই মত। বড় ডেলিকেট। সহজেই কালশিরে পড়ে তার গায়।

এখন বেশ শীত বাইরে। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দাতে বসে আছি ইজীচেয়ারে। কোটের কলার তুলে দিয়ে বাঁ হাত পকেটে, আর ডান হাত গরম পাইপে রেখে। পা দুটি তুলে দিয়েছি বারান্দার রেলিঙে।

সামনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। ধান পেকে গেছে। শীতের কুয়াশায় ধুঁয়ো ধুঁয়ো হয়ে আছে সব দিক। সারা রাত হাতী অত্যাচার করবে এই ধান ক্ষেতে। ছোট ছোট মাচান বানিয়ে পাহারা দিচ্ছে ওরা, দূরে দূরে। কিন্তু তাতে হাতীরা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। শুয়োর, হরিণ, শম্বর হয়ত ভয় পায়। হাতী মোটেই পায়না। আছাড়ী পটকাও ফাটায় ওরা মাঝে মধ্যে। কিন্তু নিষ্ফলে।

এই জঙ্গলে সব জানোয়ারই দেখেছি, কিন্তু নীল-গাই দেখিনি। নীল-গাইএরা বোধহয় এত ঘন-জঙ্গল পছন্দ করেনা এবং এত পাহাড়ী জায়গাও। মোটামুটি সমতল এবং টিলা-প্রধান জঙ্গলে—একটু শুখা জায়গায় যেমন বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশেই এদের বেশী দেখেছি। দশপাল্লার খন্দদের আবাস, উঁচু পাহাড় বিড়িগড়ে নীলগাই দেখেছিলাম। ওড়িয়াতে নীলগাইকে বলে "ঘড়িং।" "পারিধী" উপন্যাসে একটা পুরুষ নীলগাই-এর কথা আছে। যদিও তাকে কে বা কারা গুলি

করে মেরে ফেলে গেছিল। এখানে কেন দেখা যায় না, তার কারণ ন্যাচারালিস্টরা বলতে পারবেন।

তোমাকে বোধহয় আমার একতরফা বুক্‌নীতে একেবারে ক্লান্ত করে দিলাম এতক্ষণে। ঠিক আছে। রাত হয়েছে, ঘুমোও এখন।

আমি দেখতে পাচ্ছি মনের দূরবীনে, ঘুমোচ্ছো তুমি। গলা, বুক ও কাঁধের কাছে ফ্রিল্‌ দেওয়া হালকা নাইটি পরেছো একটি। হালকা গোলাপি ফুল-ফুল কটন-প্রিন্ট এর উপর। পাশ ফিরে শুয়ে আছো তু হাতের পাতা এক করে। খাটের পাশের ছোট আলোটা জ্বলছে। তোমার শায়িত শরীরের ছায়া পড়েছে ড্রেসিং টেবলের আয়নাতে! তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ, খুব আস্তে আস্তে, সন্ধ্যেবেলায় স্থলপদ্মরা যেমন পাঁপড়ি গুটোয়, তেমন করে।

ঘুমোবার সময় তুমি তু হাতের পাতা জুড়ে, গালের নীচে রেখে শোও কেন বলত? তুমি কি তোমার অপারগতার জন্যে আমার কাছে রোজ ক্ষমা চাও? হাতজোড় করে?

ক্ষমা আমি করব না, করিনি। মৃত্যুর পরও করব না। ভূত হয়ে তোমার ঘরে, তোমার আদর-খাওয়ার খাটে দাপিয়ে বেড়াব।

তোমার স্বামীর কাঁধে ভর করে ধেই ধেই করে নাচব, তোমার গুণ্ডা ছেলের মাথায় উড়নচাঁটি মারব, তোমাকে জ্বালিয়ে খাব। কেটে-কুটে; চেটে-পুটে। আমাকে তুমি যে

কষ্ট দিয়েছো এ জীবনে, তার প্রতিকার এ জীবন এবং আরও অনেক জীবনেও হবে না। অতএব তৈরী থেকো। একেবারে টিট্‌-ফর-ট্যাট্‌ যাকে বলে, তাইই করব।

হুঁ! হুঁ! পেঁত্নী, আঁমি ভূঁত হঁয়েও তোঁমাকে আঁদর কঁরব।

চৈনিক দার্শনিক কনফ্যুসিয়াস্‌ বলেছিলেন: If you pay evil with good, what do you pay good with?

সুতরাং I will pay evil with evil।

অঁতঁএঁবঁ অঁতিঁ সাঁবঁধাঁনে থেঁকোঁ।

তোমার চোখের পাতায় চুমু দিলাম। ছোট্ট মেয়ে, সুইট ড্রিমস্‌।

তোমার বুদ্ধদেবদা

চিফ্ এঞ্জিনীয়ারস্ বাংলো
পনিয়াটি ওয়ার্কশপ
জামুরিয়া হাট
বর্ধমান

মহুয়া,

বাইরে এক হাজার ব্যাঙ ডাকছে।

সত্যি!

তুমি বলবে, সবকিছুই বাড়িয়ে বলা আমার অভ্যাস। আমি বলব, হয়ত বাড়িয়ে বলি ; সময়ে সময়ে, কিন্তু সবকিছু, সবসময় নয়।

তোমাকে আকাশের সমান ভালোবাসি এটাও যেমন বাড়ানো নয়, এই রাতের ব্যাঙ ডাকাটাও নয়। জানি, এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স্ হলো।

কিন্তু ব্যাঙ মোটেই ফ্যাল্না জিনিস নয়। গত সপ্তাহে শিলিগুড়িতে ছিলাম। শিলিগুড়ির কাছেই বাগ্‌ডোগরা এয়ার পোর্টের রাস্তা থেকে ডান দিকে ব্যাঙডুবি বলে একটি জায়গা আছে। ইণ্ডিয়ান আর্মির বড়ঘাঁটি। সেখানে ব্যাঙ কবে ডুবেছিল অথবা কাকে ডুবিয়েছিল তা জানিনা—কিন্তু একটি মিলিটারী গেস্ট-হাউস আছে সেখানে, একেবারে লাজোয়াব। কিন্তু আমি ত আর কেউ-কেটা নই যে,

আমাকে ওখানে থাকতে দেবেন মিলিটারি টপ-ব্রাসেরা? আমি ত রাজনীতি করি না। আমি যে সামান্য একজন লেখক। শুনেছি, ইন্দিরা গান্ধীও হেলিকপটারে করে এসে ওখানে ওঠেন। হবে! নেতা-ভোগ্যা বসুন্ধরা!

আজকে ভি-আই-পি মানেই ত পোলিটিসিয়ান। লেখক, গায়ক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, ডাক্তার এঞ্জিনীয়র কেউই ইম্পট্যাণ্ট নন এ দেশে। যাঁরা রাজনীতি করেন এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এতবড় দেশ এবং দেশ-এর এত ভালো সাধারণ মানুষগুলির প্রতি অশেষ অন্যায়ের বেসাতি করেন; তাঁরাই সবচেয়ে সম্মানীত এই অদ্ভুত দেশে। পাবলিক সারভেণ্টের সারভেণ্ট, এখানে পাবলিকরাই। শিবঠাকুরের দেশের আইন-কানুনই আলাদা। জানিনা, কখনও এই অবস্থার পরিবর্তন হবে কী না। এয়ার-পোর্টে, রেলওয়ে স্টেশানে, সবজায়গায় ভি-আই-পি-লিস্টে, ভি-আই-পি লাউঞ্জে শুধু এঁরাই? অন্যরা কেউই নন। চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা বিন্দুমাত্রও থেকে থাকলে, বোধহয় রাজনৈতিক নেতা হওয়া যায় না।

যাক্ রাজনৈতিক নেতাদের কথা ছেড়ে আবার ব্যাঙের কথাতে আসি। ব্যাঙ ডাকছে এক হাজার। সোনা ব্যাঙ, ধলা ব্যাঙ, কালো ব্যাঙ, কুটুরে ব্যাঙ, সকলে মিলেই ডাকছে তারস্বরে। যেন, সামনেই ইলেকসান।

পনিয়াটীতে কাপুর সাহেবের এই বাংলোটি চমৎকার। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর আমল থেকেই সাহেবদের চিফ্

এঞ্জিনীয়ারের বাংলো ছিলো এটি। একপাশে প্রকাণ্ড লন, বড় বড় গাছ-গাছালি হাতাতে। অন্যদিকে বিস্তৃত জায়গা, ভোর না হতেই পাখি আর হনুমানদের ভীড়। আর পেছন দিকে, আদিগন্ত ধান ক্ষেত। সেখানে ব্যাঙেদের রাজ।

ব্যাঙ আর হনুমান দেখলেই আমার আবার রাজনৈতিক নেতাদের কথা মনে পড়ে যায়। কি যে করি!

আমাকে যে-ঘরে শুতে দিয়েছেন ওঁরা, তার পিছনে বাংলোর হাতা, কুঁয়োতলা এইই সব—তারপরই ধানক্ষেত। ঘরে একটা মান্ধাতার আমলের এয়ারকণ্ডিশানার আছে। তার প্রচণ্ড আপত্তি, তাকে চালানো হলে। তবুও, পুরোনো জুতো এবং স্ত্রীর মতই বিশ্বস্ত। যদিও ঘর যত-না ঠাণ্ডা হয়, আওয়াজ হয় তার চেয়ে বেশী। হয়ত ঘর ভালোই ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু এমনিতেই এত বৃষ্টি হচ্ছে আর ঠাণ্ডা আছে যে; আমি তাকে নিবৃত্তি দিয়ে পাখা চালিয়ে জানালা খুলে শুয়ে শুয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। জানালা খুললাম বলেই ব্যাঙেদের ঐকতান কানে আসছে! তোমার শরীর মনের সব জানালাও খুলে রেখো সবসময়, দেখবে কত শব্দ ও গন্ধের শরিক হবে। আমার আদরের সামিল হবে তুমি।

তুমি কখনও অপরিচিত বিড়াল, কুকুর বা পাখি বা বাঁদরের মুখের দিকে যত্ন করে চেয়ে দেখেছো?

দেখলে, দেখতে পেতে। তারা প্রত্যেকেই কত আলাদা এবং তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব কত লক্ষ্য করবার।

এমন কি টিকটিকিও।

তোমার বাথরুমের টিকটিকি নয়, যে কোনো টিকটিকির চোখেই ভালো করে তাকিয়ে দেখো—ওরা ভীষণ ভালো মানুষ, মিষ্টি, মেয়েলী, মেয়েলী।

তা বলে কুমীর কিন্তু নয়। কুমীরের চোখে তাকানোই যায় না। কারণ যতক্ষণ চরে বা ড্যাঙ্গাতে রোদ পোয়ায়, ততক্ষণই ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমোয়। ওরা মেয়েলীও নয়, পুরুষালীও নয়, ওরা প্যাত্‌পেতে, থিক্‌থিকে, কাদা-ঘাঁটা এক উদ্ভট জীব—। ওদের দেখলেই ঘেন্না হয়, গা-শিউরে ওঠে, ওদের কান্না আর রাজনৈতিক নেতাদের কান্না একইরকম।

ব্যাঙ ডাকছে। ব্যাঙদের ডাকও, স্টীমারের ভোঁ এর মত একটি সরলীকৃত স্থির, নিষ্কম্প ব্যাপার। উত্থান-পতন বা আরোহণ-অবরোহণের কোনো বালাই আছে বলে মনে হয় না ওদের গলায়। ওদের গলাতেও স্টীমারের ভোঁ এর মতই কোনো কোমল পর্দা দেন নি ভগবান। শুদ্ধ পর্দাতেই, সব স্বর নয়, মাত্র কয়েকটি স্বর ওঠা-নামা করে। সেই জন্যে, একটু একঘেয়ে লাগে। কিন্তু ওরা জানে না যে, একঘেয়েমিটাই ওদের স্ট্রং-পয়েন্ট। মনোটোনী সর্বক্ষেত্রে বর্জনীয়, একথা বলা চলে না। যেমন আমাদের সাঁওতাল বা ওরাঁওদের গান। ওঁদের গানের দোলানী সুরের পুরো মজাটা মনোটোনীরই মধ্যে।

—৩

স্বরো, এই গানটি ঃ

"রাজা চলে সড়কে সড়কে,
রানী চলে বিন্ সড়কে,
রাজা মাথে সোনা-ছাতা
টুকুরী যো উড়ে গে
রানী হাস্‌সে দেখে মনে মনে………"

এই গানের তাল, আর সুর আর ছন্দ সবই যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

মনে আছে। দ্বারিকদার জসিডিহর চিড়িয়াখানার কাছের সেই কুকড়াডিহ সাঁওতাল গ্রামে রাতভর নাচের কথা? ও ও সরি! তুমি ত যাওইনি সেখানে। অথচ স্বপ্নে, চাঁদনী রাতে, তোমাকে আদুড়-গা করিয়ে, সাঁওতালী মেয়েদের মত শুধু একটি শাড়ি পরিয়ে সেই বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে রাতের পর রাত কল্পনায় কতই না নাচ নেচেছি। এবং নাচের পরে, উদোম গায়ে, খোলা-হাওয়ায় ঝর্‌ঝর্ করে হাওয়া-বওয়া অশত্থ গাছের তলায় শুয়ে কল্পনায় শব্দহীন সমারোহে তোমার সঙ্গে পৌনঃপুনিক পুলকে সঙ্গম করেছি।

সৈয়দ মুজতবা আলী কোথায় যেন লিখেছিলেন, কোথায় ঠিক মনে নেই; লিখেছিলেন ঃ স্বপ্নেই যখন পোলাউ রাঁধছ, ভায়া, তখন আর ঘি ঢাল্‌তে কঞ্জুষী করছ কেন?

কঞ্জুষী আমি করি না। তুমি 'আমার স্বপ্নেরই পোলাউ!' তাই দরাজ ঘি ঢালি আমি। ওয়াট্ আ পিটি! তবুও তুমি

প্রস্তরীভূতই রয়ে গেলে! থাকবেও! তোমার উদ্ধার নেই—উত্তরণ নেই—সবচেয়ে দুঃখের কথা, তোমার অধঃপতিত হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই! এর চেয়ে বড় দুর্যোগ যেন কোনো মানুষের জীবনে না আসে। গতিহীনতা, থেমে থাকা মানেই মৃত্যু। এর চেয়ে জাহান্নামে যাওয়া ভালো।

এই জামুরিয়া-হাট পেরিয়ে, পনিয়াটি ওয়ার্কশপে এসেছি মিস্টার এণ্ড মিসেস কাপুরের অতিথি হয়ে; ওঁদেরই কাজে। কাজ আসানসোলে, কিন্তু আসানসোল থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো মাইল দূরে ওদের বাংলোতে এসেই উঠতে হল। আদর যত্নের ত্রুটি নেই। স্কচ্ হুইস্কির পর চারকোর্স ডিনার। এবং এখন ব্যাঙদের গার্ড অফ্ অনার। বেশ লাগছে।

কিন্তু ব্যাঙ ডাকলেই আমার খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে। আর বৃষ্টি পড়লেও। মনে পড়ে যায়, কুকুরের ঘ্যাঁট এর মতো খিচুড়ি রান্না করে খাইয়েছিলে তুমি একদিন! রাগ কোরোনা, তুমি নিজে খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত সুখাদ্যর মধ্যেই গণ্য, কিন্তু তোমার হাতের রান্না অতি অখাদ্য। রান্না কিন্তু মেয়েদের মস্ত গুণ। বিলোল 'কটাক্ষ যা না পারে, ভাল রান্না, করা তৈল-কৈ অথবা চিতলের-পেটি তাই-ই পারে! শুনে রাখো কথাটা!

দ্যাখো, আমি না বললে, কে এমন সত্যি কথা বলবে তোমাকে বল? সংসারে সত্যি কথা শোনার বা বলার লোক বড় বেশী জোটে না। আমার তুমি। তোমার আমি!

আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে। চার ঘণ্টা ট্রেনে বসে থাকা

এবং তারপর একঘন্টা গাড়িতে—বড়ই ক্লান্তিকর। যাঁরাই নিজেরা গাড়ি চালান তাঁদের পক্ষে গাড়িতে প্যাসেঞ্জার হয়ে বসে যাওয়া ভীষণই ক্লান্তিকর। তোমার বরকে জিগ্‌গেস কোরো। দেখবে, ও-ও তাই-ই বলবে।

আসলে চিঠিটা আরম্ভ করেছিলাম বেশ জুৎকরে। অনেক কিছু লিখব ভেবে, কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এ্যাইরে, একটা ব্যাঙ ধরলো সাপে—! এবার গিলছে। শনৈঃ শনৈঃ।

গিলুক। আমি ঘুমোই। তুমিও ঘুমোও। মনে মনে আমার এখানের ব্যাঙদের অক্রেস্ট্রা ল্যাসার-বীম্-এ তোমার শোবার ঘরে ট্রান্সফার করে দিলাম।

মাইনাস, সাপের ব্যাঙ গেলার আওয়াজ।

গুডনাইট। স্লীপ টাইট। সুইট ড্রিমস্।

তোমার বুদ্ধদেবদা

এই উত্তরবঙ্গ বড় ভালো লাগে আমার। পূর্ব-আফ্রিকার শীতের সেরেঙ্গেটি—কানাডার পাতা-ঝরার আগের সময়ের জঙ্গলের মত, এই হিমালয় তিস্তা এবং শাল-সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে আমি আমার নিজের গায়ের গন্ধ পাই। একটা আদিমতার গন্ধ। প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ। সমকালীনতা এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। অতীত দিকভ্রষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ, রবার্ট-ফ্রস্ট্-এর কবিতারই মত বনপথের মোড়ে এসে কোন্ পথ বেছে নেবে বা নেবে না, এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে স্তব্ধ হয়।

তোমার মনে আছে, একদিন হাজারীবাগের সীমারীয়ার জঙ্গলের বাংলো থেকে বেরিয়ে এক শীতের চাঁদের রাতে তুমি আর আমি হাত-ধরাধরি করে ঝরা-পাতার পথে হাঁটছিলাম?

তুমি রবার্ট ফ্রস্ট্ আবৃত্তি করছিলে স্বগতোক্তির মত!

"................................. .

I shall be Telling this with a Sigh
Somewhere ages and ages hence :
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less travelled by
And that has made all the difference."

কত কথাই মনে পড়ে। কত দিন ও রাতের কথা। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কথা। দীঘার কথা। চিল্কা হ্রদ আর সমুদ্রের মধ্যবর্তী ছর্‌পড়িয়ার কথা—যেখানে আমি আমার জীবনের প্রথম কৃষ্ণসার হরিণ মেরেছিলাম, বালিয়াড়ির উপরে আমার

চিরদিনের সাদাপেট, নরম, কৃষ্ণসার হরিণীটির পাশে শুয়ে থার্টি ও সিক্স্‌ রাইফেল দিয়ে ?

হরিণের বুকের রক্ত দেখে তুমি কেঁদেছিলে ! মনে আছে ?

তোমরা মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। একটি পুরুষ হরিণ, যাকে নির্ভুল নিশানায় অষ্ট্রিয়ার তৈরী রাইফেলে, ইংল্যাণ্ডের তৈরী গুলি দিয়ে একমুহূর্তের কষ্ট-না-দিয়ে মেরে ফেললাম তার বুকের রক্ত দেখে তোমার দুচোখ জলে ভরে গেছিল।

আর আমি ?

এই পুরুষ হরিণটির বুকের রক্তাক্ত ক্ষতটি এখনও তোমার চোখে পড়ল না !

তোমরা হয় খুউব চালাক ; নয়ত খুবই বোকা। এই দুয়েব একটিও যদি না হও, তাহলে তোমরা হচ্ছো নির্ভেজাল হারামজাদী।

একসকিউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু হারামজাদীর যে কোনো ভদ্র প্রতিশব্দ নেই। কি করি ?

বাইরে ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নামল আবার। কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি ! কালিঝোড়া থেকে এতদূর গাড়িতে এলাম—সারা পথই বৃষ্টি। তিস্তা এখন বৃষ্টিতে ভিজছে। ভিজছে কালিঝোড়া। কত হাজার বছর ধরে ওরা দুজনে মিলিত হচ্ছে এই ভাবে—সাক্ষী থাকছে জংলী কলাগাছের বন আর নানারকম কটুগন্ধী অর্কিড আর হাইবিস্‌কাস ফুলেরা।

হিমালয়ে হাইবিস্‌কাস ফুল থাকবেই। অনেকদিন আগে

ডম্ মোরেসের একটি কবিতাতে কোনো নেপালী মেয়ের কথা পড়ছিলাম, উরুসন্ধির বর্ণনা "Show me the hibiscus flower between your thighs" !

দারুণ উজ্জ্বল না পংক্তিটি? তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম বলে উচ্ছলতায় চোখই শুধু ধেঁধেঁ গেছিল যে শুধু তাই-ই নয়, কর্ণমূল, গণ্ডমূল এবং যাবতীয় পুরুষালী মূল উত্তেজনায়, এবং এক দুর্বোধ্য অপরাধবোধে লাল হয়ে গেছিল।

ইংরিজী ভাষাটার মজাই আলাদা। It's a language of bangs. And not of whimper !

কিন্তু কি করা যাবে? আমি যে বাঙালী,—বাংলাতেই লিখি। ইংরিজী ভালো জানি না বলেও বটে, তাছাড়া বিজাতীয় কোনো কিছুকেই জাতীয় কোনো-কিছুর মত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারি না বলেও। আমি মনে-প্রাণে বাঙালী, ভারতীয়। এবং গর্বিত সে কারণে। Despite the "hibiscus between the thighs" !

আজকে ছুটি চাইছি, মহুয়া। অনেক আন্‌পার্লামেন্টারী এবং অসভ্য কথা লিখলাম এ চিঠিতে। ঘরের এয়ার কণ্ডিশনারটা চালিয়ে শুয়ো। নইলে কষ্ট পাবে গরমে। কোলকাতা ত আর শিলিগুড়ির মত ঠাণ্ডা নয়। আমি আমার ঘরের এয়ার-কণ্ডিশনার বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি। পাছে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাই, সেই ভয়ে। আসলে, বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমুব বলে।

বৃষ্টির পায়ের শব্দ তুমি ভালো করে শুনেছো কখনও?

বলোত, বৃষ্টি কি রকম জুতো পরে ? হিল-তোলা না হিল-ছাড়া ? চটি, না জুতো ?

বৃষ্টির পায়ের শব্দ ভারী মিষ্টি। আমার জানালার কাঁচে সে দৌড়ে এসে তার ছোট ছোট নরম হাত দিয়ে আল্‌তো করে করাঘাত করছে এখন কোনো কিশোরীর নরম আল্‌তো ফিসফিসে ভালোবাসার মত। যেন জানালা খুললেই; কোনো রূপকথার রাজকুমারীর মতো বৃষ্টি আমার বিছানার ভাগীদার হবে। তার পর সারারাত সব রূপকথার রাজকুমারীদের মত চিরকুমারী হয়ে শুয়ে থেকে, ভোরের বেলা ডাগর চোখে আমায় বলবে, উঃ কী ব্যথাই না লেগেছে পিঠে, …সারারাত ঘুমুতে পারিনি। তখন বিছানার গদী তুলে দেখবো আমি যে, নীচে একটি ছোট মুসুর ডাল। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাব। সে বলবে, আমার ঐ ছোট মুসুর ডালেই ব্যথা লাগে যে বড়! ওতেই ব্যথা লাগে—আমি যে রাজকুমারী!

কিন্তু মহুয়া, মুসুর ডালেই যাদের ব্যথা লাগে, তেমন রাজকুমারীরা আমার পাশে যেন কখন এসে না শোয়। মিষ্টি বৃষ্টির মত ফিস্‌ফিসে, আল্‌তো, ইন্‌ডিফারেণ্ট, ইন্‌সিপিড, রাজকুমারীদের কোনোই প্রয়োজন নেই আমার। আমার রাজকুমারী তুমি! যে পজিটিভ, যে ভালোবাসায় পার্টিসিপেট করতে জানে, যে ঐতিহ্য ও সংস্কারাচ্ছন্ন বিশুদ্ধ ভারতীয় মড়া নারীদেহ নয়, যে জীবন্ত, প্রাণবন্ত, যে শুধুই আদর খায়না; আদর করেও। ভীষণ, ভীষণ; ভীষণ।

"দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া, তোমায় আমায় এই চলেছে জনম জনম। মরণ কি আর তারে থামায়, দেওয়া নেওয়া..."

পাড়ন মী! গুরুদেব টেগোর!

তোমার

বুদ্ধদেবদা

ইণ্টারকন্টিনেণ্টাল
তাজমহল বম্বে

মহুয়া,

বোম্বেতে এলে মনেই হয়না যে, ভারতবর্ষেরই কোনো প্রান্তে আছি। দিল্লিতে গেলেও তা মনে হয় না, তবে তা মনে না হওয়ার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যাঁদের কাজে এসেছি, তারা একটি সুইস্ কোম্পানী। ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট-এ ইণ্ডিয়ানাইজেশান হয়েছে। এখন বিদেশী শেয়ার হোল্ডিং মাত্র ফর্টি-পার্সেন্ট। যেমন নিয়ম।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটর বোম্বে শহরে তাঁদের অফিস থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে একটি ছিমছাম নিরিবিলি সমুদ্রপাড়ের এলাকাতে থাকেন। সেখান থেকে গাড়িতে করে অফিস পৌঁছান সকাল সাড়ে নটার মধ্যে—বাড়ি ফিরে যান সাতটার মধ্যে। কোলকাতায় বসে একথা ভাবলেও অবাক লাগে। তিন-মাইল দূর থেকে অফিস পৌঁছতে সেখানে যে একই সময় লাগে প্রায়।

বম্বের তুলনায় কোলকাতাকে গ্রাম বলে মনে হয়। আর লোক ?

কোলকাতায় কী লোক! কী লোক!

বম্বের হালচালই আলাদা! পয়সা উড়ছে আকাশে।

ধরে নিলেই হল। তাবলে, বম্বেতে যে গরীব নেই এ কথা মহামূর্খও বলবেন না। তবু, পুরো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক এখন এই পশ্চিমপ্রান্তে। কোলকাতা তার স্থান হারিয়ে ফেলেছে বহুদিন হল। তার জন্যে আমরা নিজেরাও অনেকখানি দায়ী।

এই পিছনে পড়াতে বাঙালীর ভাল হয় নি। রাজনীতি যদি দেশ বা দশের ভালোর চেয়ে বড় হয়, তাহলে যা ঘটবার তাই-ই ঘটে, ঘটেছে। একথা নেতাদের ভাববার। নিজেদের কোনো-মতে চোখ-ঠারার জন্যে নয়—নিজেদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার তাঁদের।

বোম্বের যানবাহন পথ-ঘাট নিয়মানুবর্তিতা, বৈদ্যুতিক বন্দোবস্ত সবই কোলকাতার চেয়ে অনেক ভাল। টাটা কোম্পানী নাকি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন। লোড শেডিং—হয়ই না বলতে গেলে। প্রখর গরমের সময় সামান্য হয়। এখানে বিদ্যুৎও আসে হাইডাল পাওয়ারে।

এই কষ্টের কারণটা ব্যাখ্যা করা চলে, কারণ অসুবিধা হয় অতি অল্প সময়ের জন্যে—জলের কষ্টও হয় সেই সময়। জল কমে গেলে স্বাভাবিক কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু ইণ্টারইউনিয়ন রাইভাল্‌রী এবং এক দলের সঙ্গে অন্য দলের কামড়াকামড়িতে একটা রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানা প্রায় উঠে যাবার অবস্থা হয়েছে লোড শেডিং-এর বাড়াবাড়িতে—এ কথা বম্বের লোকদের পক্ষে বিশ্বাস করাও কষ্ট।

এখনও আমাদের চোখ না খুললে, কবে খুলবে জানি না। বাঙালী ক্রমশঃ ভিখিরি, আর ছিঁচকে চোরা-চালানকারী এক আত্মসম্মানজ্ঞানহীন দূরদৃষ্টিহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছে। বিধান বাবু যা কিছুর গোড়াপত্তন করে গেছিলেন, দুর্গাপুর, দীঘা, সল্ট লেক, কল্যাণী সবকিছুই একে একে গড়ে উঠেছে। কিন্তু নতুন কি কিছু হল? দেখি, জ্যোতিবাবুরা যদি করেন এবার। জ্যোতিবাবু এবং প্রমোদবাবুর ব্যক্তিত্বে এখনও অবধি ভরসা রাখি। একটা কথা বলতে হবেই যে, বামফ্রন্ট ক্ষমতাতে আসার পর থেকে, ভেসে-যাওয়া বাঙালী জাতি একটা নতুন শিকড় পাচ্ছে। এই শিকড়েকে আরও শক্ত করার সময় হয়েছে।

মশা তাড়িয়ে এদেশ থেকে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর সব তাড়িয়ে গেছিলেন বিধানবাবু। আজ এতবছর পর কোলকাতার মত বড় শহরেও প্রত্যেক বাড়িতে ম্যালেরিয়া! যে কোনো সভ্য দেশের মানুষই শুনলে, শিউরে উঠবে।

শুধুই গলাবাজী নয়, শ্লোগান নয়, যা আপাত-দৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু এবং যেসব সমস্যার প্রতিকার অবশ্যকরণীয় সেইসব সমস্যার সমাধান করা উচিত। সাধারণ অথবা অসাধারণ নাগরিকমাত্রই এইটুকু ন্যায্যদাবি নিশ্চয়ই সরকারের কাছে করতে পারেন। আত্মতুষ্টি এবং সমালোচনা-ভীতি কোনো সরকারকেই সুপথে এগিয়ে নিয়ে যায়না। একদিন বাঙালী বলে নিজেরা পরিচিত হতে, পরিচয় করাতে গর্বে বুক ফুলে উঠত, আর আজ বাঙালী সব দিক দিয়ে ক্রমাগত পিছোতে পিছোতে কোথায় এসে

পৌঁছেচে! সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী নেতা নামক যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে নেতার মত নেতা আছেন কজন?

বর্তমানে, কেন্দ্রে, বাঙালীদের নেতৃত্ব যাঁরা করছেন তাঁরা বাঙালী জাতের সম্মান-বৃদ্ধি করার মত কেউই নন। "এয়ার-কণ্ডিশানড প্লেন থেকে এয়ারকণ্ডিশানড গাড়ি, এয়ারকণ্ডিশানড গাড়ি থেকে এয়ারকণ্ডিশানড হোটেল, এয়ারকণ্ডিশানড হোটেল থেকে এয়ারকণ্ডিশানড অফিস—আবার এয়ার কাণ্ডিশানড অফিস থেকে এয়ার কণ্ডিশানড গাড়ি······" এমন একটি বাক্য লিখেছিলেন, তাঁর "এ্যাম্বাসাডরস্ জার্নাল" বইয়ে, আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জন গ্যালব্রেফ। ইকনমিস্ট! কথাটি, এবার বম্বে এসে আমার বার বার মনে পড়ছিল।

তোমার কি মনে হয় না যে, আমাদের দেশে আমাদের সমাজ এবং রাজনীতির পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাঁরা ভণ্ডামির এক কট্টর কমপিটিশানে নেমেছেন? দেশের কাজ করলে, অথবা গরীবদের প্রতি দরদ থাকলে সেই ব্যাক্তিকে গান্ধীজীর মত কৌপিন পরে বেড়াতে হবেই যে, এমন মতবাদের সঙ্গে আমার মতের একেবারেই মিল নেই।

প্রায়ই, লোককে বলতে শুনেছি, এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরে বসে গরীবের জন্যে কেঁদে কূল পাচ্ছেন না অমুকে। এই উক্তির পিছনে একধরনের মূর্খামি ও হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই বলেই কি মনে হয়না তোমার?

যাঁরা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেন এবং মাথার কাজ, তাঁরাই জানেন যে, এয়ার-কণ্ডিশানিং থাকলে কাজ করতে ক্লান্তি আসে না। বাইরের রোদ ; পাখার হাওয়ায় কাগজ পত্র ওড়া, এসবের হাত থেকে বাঁচা যায়। এবং স্বাভাবিক কারণে কাজও বেশী করা যায়।

এ কথাও সত্যি যে, যাঁরাই এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরে বসে কাজ করেন তাঁরাই নানারকম শারীরিক অস্বস্তিতে ভোগেন। কারও সর্দি লাগে। যাঁদের সাইনাসাইটিস্ বা ইসিনোফিলিয়ার রোগ আছে, তাঁরাও খুবই কষ্ট পান। বাতেও ভোগেন অনেকে। কিন্তু যেহেতু এতে তাঁদের কাজের সুবিধে হয় অনেকখানি এবং যেহেতু একজন পুরুষের জীবনে তার কাজের চেয়ে বড় অন্য আর কিছুই হওয়া উচিত নয় ; সেইহেতু এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এয়ার-কণ্ডিশানড অফিসে বসে তাঁরা কাজ করতে বাধ্য হন।

বিধানবাবু এবং জ্যোতিবাবুও এয়ার-কণ্ডিশানড অফিসে বসে কাজ করেছেন এবং করেন—কারণ তাঁরা দুজনেই আঠারো ঘণ্টা করে পরিশ্রম করার মানুষ। যাঁরাই কাজের লোক তাঁরাই জানেন, তথাকথিত জনদরদী মানুষের এই "আরাম হারাম হ্যায়" এর ফাল্‌তু শ্লোগান কত লোক-দেখানো। যেদিন আমরা এই সব বাইরের ভড়ং ছুঁড়ে ফেলে সত্যিকারের এক কেজো জাত হতে পারবো—কাজ-পাগলা জাত, সেদিনই আমাদের উত্তরণের পথ খুলবে। এবং হয়ত অয়ন পথও।

বোম্বেতে এলেই কোলকাতার হীনাবস্থা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীদের ক্রমশ নেমে যাওয়াটা প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে এবং কষ্ট হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কবে বলেছিলেন যে, ব্যবসা না করলে বাঙালীর উন্নতি নেই—অথচ আজও!

তবে বাঙালী একটু একটু করে ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে এটা সুখের বিষয়। বললে, বিশ্বাস করবেনা হয়ত, প্রতিদিন আমার কাছে চার থেকে আটজন ছেলে বিভিন্ন রকম চাকরীর খোঁজে কারো না কারো সুপারিশ নিয়ে আসে। তাদের বেশীর ভাগেরই যা বিদ্যা, মানে এ্যাকাডেমিক বিদ্যা, তাতে মাড়োয়ারী গুজরাটি-পাঞ্জাবী সংস্থায় সামান্য মাইনের কোনো চাকরী হলেও হতে পারে। তাদের প্রত্যেককে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, যে-কোনো ব্যবসা করো। একটা পানের দোকানদারও টাই-পরা, হাতে ব্রিফ-কেস ঝোলানো চাকুরীজীবীদেব অনেকের থেকেই বেশী রোজগার করে। পানের দোকান করতে বেশী ক্যাপিট্যাল লাগে না।

কোলকাতায় কোনা বাঙালী পানের দোকান দেখেছো? কটি?

কিন্তু এসব কথা বললে, তারা মুখ ব্যাজার করে চলে যায়।

আমি জানি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরে গিয়েই বলে, "শালা, এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরে বসে জ্ঞান দিচ্ছে!"

কি করব? আমি নিজে বাঙালী বলে এবং ছেলেমেয়েদের

জন্যে করার মত কিছু করতে পারিনা বলে ভারী দুঃখ হয় আমার। আমার দুঃখের গভীরতা ও স্বরূপ ঠিক কি, তা আমিই জানি। আর অন্তর্যামীই জানেন। অন্যকে তার প্রমাণ দেওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে করিনা। আমার বিবেকের কাছে আমি নিজে পরিষ্কার।

একটা, এত মহান ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং মহৎ সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল জাত কিরকম লক্ষ্যভ্রষ্ট, নেতৃত্বহীন, উদ্দেশ্যহীন হয়ে কচুরি পানার মত বদ্ধ জলে ভেসে রয়েছে এ কথা মনে হলেই আমার বুকের মধ্যে বড়ই কষ্ট হয়। খুবই কষ্ট।

ইতি তোমার বুদ্ধদেবদা

সেরোনারা লজ
সেরেঙ্গেটি প্লেইন্‌স
ইস্ট-আফ্রিকা

আমার মহুয়া,

আঃ কি সুন্দর সকাল।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, কিন্তু ঝক্‌ঝকে দিন। একটা জিরাফ চরছে জানালার পাশে এবং কতগুলো ম্যারাবু্য স্টর্কস্। মাঝে মাঝেই থম্‌সনস্ গ্যাজেলের ঝাঁক দেখা যায়—। তবে দিনের বেলা খুব বেশী থাকেনা ওরা।

এই সেরোনারা লজ একজন ফ্রেঞ্চ স্থপতির প্ল্যানে তৈরী। স্বাভাবিক কালো পাথরের টিলা ও গোলাকৃতি মসৃণ সব পাথরের সঙ্গে কংক্রীট ঢেলে চমৎকার লজটি বানানো হয়েছে। সত্যিই চোখ জুড়োনো এর স্থাপত্য। চোদ্দ হাজার বর্গ কিমি ঘাসবনের মধ্যে এই কোপীগুলির বুকে লজটি বহু মাইল দূর থেকে দেখা যায়। এই অদ্ভুতাকৃতি টিলাগুলোর ইংরিজি নাম KOPJE, সোয়াহিলী উচ্চারণ হচ্ছে "কোপী"।

তান্‌জানীয়া আমাদের দেশের তুলনায় অনেকই অনুন্নত ও গরীব দেশ। কিন্তু এঁদের বন-জঙ্গলকে এরা এমন ভাবে কাজে লাগিয়েছেন, যে বছরে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেন এঁরা বিদেশীদের কাছ থেকে। কেমন সুসংবদ্ধ সুব্যবস্থাতে

আপাদমস্তক মোড়া এদের পর্যটনী ফাঁদ। অতিথিরা পা দেবেনই দেবেন তাতে।

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি জংলী মানুষ, জঙ্গলের টানে যেখানে সেখানে দৌড়ে যাই। কিন্তু যাঁরা জঙ্গল ভালোবাসেন না, তাঁরাও তান্‌জানীয়াতে এসে এ সব না-দেখে চলে যেতে পারবেন না।

তুমি যদি আসতে আমার সঙ্গে!

জানি, তুমি মুখ নীচু করে বলবে, যা হয়না, তা হয়না; তবে মিছি মিছি বার বার এক কথা বলা কেন?

আমিও জানি।

তবুও বলি। কারণ না-বলে পারিনা তাই। তোমাকে ভালো-না-বেসে পারিনা, বারবার তাই এ কথা না-বলেও পারিনা।

কল্পনাতে মনে করি, তুমি আমার সঙ্গে এসেছো আফ্রিকায়, অন্ধকার আদিম আফ্রিকায়।

যাওয়ার পথে আমরা ভারতমহাসাগরের বুকে অনেকেরই অজানা, অদেখা, ছোট সর্ষে দানার মত পৃথিবীর ম্যাপে হারিয়ে-যাওয়া সেশেল্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে আসতাম।

আমার একা একা একটুও ভালো লাগেনি। একা একা কোনো সুন্দর কিছু করতে একেবারেই ভালো লাগে না। সেশেল্‌স্-এর এয়ার স্ট্রিপটি এমন যে, মনে হয় প্লেনটা বুঝি সমুদ্রের মধ্যেই নামল। প্লেনটা যখন নামতে থাকে তখন নীচে

নীলচে-সবুজ কোরাল রীফ্ জলের তলায় চোখে পড়ে। আর দ্বীপগুলো তাদের গেরুয়া বালির তটভূমিতে সবুজ কালো বন-পাহাড়ে একেবারে অনবদ্য ছবির মত। চোখের এতবড় তৃপ্তিপ্রদ ভোজ বড় কম পেয়েছি জীবনে, এত মুগ্ধ, বিস্মিত খুব বেশী হইনি—হয়ত তোমায় প্রথমবার নগ্নাবস্থায় দেখার সময় ছাড়া।

তুমিও এমনই সুন্দর। সুনীল, অতলান্ত জলরাশি থেকে কোটি কোটি বছর ধরে তিল তিল করে ভূস্তরের উত্থান পতনের প্রক্রিয়া ও নানাবিধ জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে যেমন এই হাতছানি দেওয়া গাছগাছালি, আর কোরাল রীফে ঘেরা দ্বীপপুঞ্জ তৈরী হয়ে উঠেছে অবশ্যম্ভাবী ভাবে, তুমিও তেমনি করেই সৃষ্ট হয়েছ। কত কোটি বছরের পুরুষের কল্পনার, কামনার অস্পষ্ট ছেনী-হাতুড়িতে মৃদু ভাবে কেটে কেটে বিধাতা তোমাকে গড়েছিলেন। তোমার আনত চোখ, তোমার নরম চোখের দৃষ্টি, কালো ভোমরার মত তোমার চোখের মণি, তোমার ভূ-ভারতে-নেই ভুঁরু, তোমার চলন, তোমার মিষ্টি বলন, তোমার হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, তোমার হাত, তোমার ঠোঁট দুখানি, তোমার স্তনযুগল—আহা কী সান্ত্বনাদাত্রী ঠাণ্ডা, করৌঞ্জ ফুল-গন্ধী। তোমার আরও অনেক কিছু—সমস্ত-তুমির বর্ণনা তোমার পছন্দ নয় ; দেওয়া সম্ভবও নয়।

এত কথা, শুধু এইই ভেবেই যে, যদি তুমি আসতে সেশেল্স-এ আমার সঙ্গে। কী মজাই না হতো তাহলে।

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী এবং ভারতীয় জলদস্যুদের বিচরণভূমি ছিল একসময়ে ভারতমহাসাগরের এই ভারত ও আফ্রিকা মধ্যবর্তী সমুদ্র ; ভারত-সাগর। কত জাহাজ ডুবি হয়েছে তখন এই সব অঞ্চলে, কত পুরুষের আর্তচিৎকারে সমুদ্রের ঢেউ ভারী হয়েছে, কত অত্যাচারিত নারীর করুণ কান্নায়।

সেশেলস্ এর একটি জায়গা, তার নাম বেলোম্ ; সেখানে সমুদ্রের পাড়ে জোর খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে, অনেকদিন ধরে এই বিশ্বাসে যে, জলদস্যুরা অনেক ধনরত্ন ইত্যাদি লুকিয়ে রেখেছে। ঐ তটে গভীর গর্ত করে, একেবারে সমুদ্রের গায়েই এক আশাবাদী ভদ্রলোক এই খনন-কার্য করে চলেছেন কোনোদিন মণিমাণিক্য পাবেন বলে। এবং এই প্রক্রিয়াতে, প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন।

মহুয়া, জানো, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দারুণ মিল। আমিও আমার জীবন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ খুঁড়ে চলেছি অনুক্ষণ, মণি-মাণিক্য পাবার আশায়।

আর তুমি! জলদস্যুদের লুণ্ঠিত হীরে-জহরতের মতই গভীরে প্রোথিত আছো তোমার স্বামী-পুত্রের, সংস্কারের, অনীহার, ভালো-লাগানোর, অপ্রোয়োজনীয় জীবনের সমুদ্র তটে।

এ ভদ্রলোকের মত আমিও সর্বস্বান্ত। তবুও, দুজনে খুঁড়ে চলেছি সমানে। কেউ কেউ এ জীবনে, পৃথিবীতে

খোঁড়াখুঁড়ি করেই মরে। অবার কেউ-কেউ অঙ্গুলিহেলনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা ব্যতিরেকেই সব মণি-মাণিক্য পেয়ে যায়। যারা যা পেল, তার দাম পর্যন্ত বোঝেনা—তোমার স্বামীর মত।

প্রেমিকার স্বামীর মত ঘৃনীত থিক্-থিকে পোকা-সদৃশ জীব ভগবান এই গ্রহে আর কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই না?

একটু পরেই ব্রেকফাস্ট করে হিপ্পো পুলে যাবো। আমার সঙ্গে একটি ভোক্সওয়াগান-কোম্বি গাড়ি আছে। আফ্রিকান ড্রাইভারের নাম কিলালা। এই কিলালা, সেৎসী মাছি, গাব্বুন—ভাই-পার সাপ এবং আমার আফ্রিকা সফরের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা লিখেছি "পঞ্চম প্রবাস" উপন্যাসে। আর ইয়ারোপ সফরের ফারষ্ট্-হ্যাণ্ড অভিজ্ঞতা, যারা কখনও ইয়ারোপে যাননি এবং হয়ত যাবেনও না, তাঁদের যাতে ইয়ারোপ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হয় এ কথা মনে রেখে লিখেছিলাম "প্রথম প্রবাসে"। বড় ভ্রমণোপন্যাস।

সেদিন তুমি বলছিলে, ইদানীং তোমাকে আমার সদ্য প্রকাশিত বই দিইনা আমি। এবং কেন দিইনা?

দিইনা, কারণ তুমি অনেকই বদলে গেছ। তুমি আজকাল আমার বইত দূরের কথা, প্রায় কোনো কিছুই পড়োনা। তোমার ছেলে, তোমার স্বামী, তোমার ছোট বাড়ি, ছোট জীবনে, বইয়ের মত উদার উন্মুক্ত আকাশ কি আঁটে? তুমি আজ নীড়ের পাখি নও, দাঁড়ের পাখি। সমাজের, অভ্যাসের, সংস্কারের দেওয়া দয়ার দান, দয়ার দানা খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকো।

তোমাকে নিয়ে যে-সব বই লিখেছিলাম একদিন—যে-সব বইয়ের নায়িকা তুমি ; সেই সব বই পড়েও তুমি এমন ভাব করেছো তখন, যেন তুমি বুঝতে পর্যন্ত পারোনি যে ; তোমাকে নিয়েই লিখেছি।

মানুষকে, অন্য মানুষ অনেক ভাবে অপমান করতে পারে। লক্ষ্য-না-করা উদাসীনতার অপমান কিন্তু ভীষণ লাগে। তার চেয়ে অত্যাচার, অসম্মান অনেক সহনীয়। তুমি বড় নিষ্ঠুর। তোমাকে আর কতদিন চুরি করে ভালোবাসব? চুরি করে দেখব? চুরি করে করে যে, একেবারেই চোর হয়ে গেলাম।

নাঃ! "আমি হেরিব না আর এ কালো বরণ। যে যে সখী কালো আছে, তাদের বলে দে যেন না আসে কাছে ; আমার কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে ; আমি তাই করি বারণ।

আমি হেরিব না এ কালো বরণ।"

গানটি মনে পড়ে গেলো। চণ্ডীদাস মাল মশায়ের গলায় শোনা। পুরাতনী—টপ্পা। রাধার কৃষ্ণ ছিল কালো, আর আমার রাধা হচ্ছে কালো। কিন্তু রাধা আমার বড় লাজুক, বড় বিমুখ ; সমস্ত জীবনটা তবে আরাধনা করেই কেটে যাবে আমার—পাওয়া হলো না। হবে না।

দেখেছো, আটটা বেজে গেছে। এক্ষুনি বেরোতে হবে ব্রেকফাস্ট করে। কিলালা, লবী থেকে ফোন করে তাড়া দিল এক্ষুনি।

*   *   *   *

ঘুরে এলাম হিপ্পো পুল থেকে। কিলালা গতবার বলেছিল বটে যে, আমার মত ট্যুওরিসট্ নিয়ে ও আর আসবে না। কিন্তু আবার ও এসেছে। যে, আমার সঙ্গে একবার ঘনিষ্টভাবে মিশেছে, সেইই আমার প্রেমে পড়েছে অনেক দোষ সত্ত্বেও— এমনকি কিলালার মত কালো কদমফুল-চুলের গুণ্ডামার্কা আফ্রিকাবাসী পুং-লিঙ্গও। তুমিই একমাত্র মেয়ে যে, আমাকে অপছন্দ করে গেলে সারাজীবন, অথচ তোমাকে যে অপছন্দ করি একটুও, সে সম্ভাবনা কখনও দেখা দিলো না আমার জীবনে।

আফ্রিকা এবং বিশেষ করে রিক্ট ভ্যালী সত্যিই এক দেখবার মত জায়গা। এখানকার লোকেদের চেহারা, তাদের চরিত্র, আশ্চর্য সব আদিবাসি, বিশেষ করে মাসাইরা আমাকে জাদু করেছে। সুযোগ সুবিধা এবং আমাকে বহন করার মত মক্কেলের শক্ত কাঁধ পেলেই বার বার আসব আফ্রিকাতে।

জায়ের যাবারও খুব ইচ্ছে ছিল। ওখানে আমার এক বন্ধু আছেন। লুমুবম্বাসীতে। তানজানীয়া এবং কেনীয়া থেকে ওখানে যাবার সুবিধে নেই। জায়ের যেতে সুবিধে, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্ থেকে। কারণ, জায়ের বেলজিয়ান কলোনী ছিল। তাই ব্রাসেলস্ থেকে ডায়রেকট ফ্লাইট নিয়ে যাওয়া যায়। জায়ের গেলে, কঙ্গো-বেসিনের সৌন্দর্য দেখা যাবে।

কঙ্গো নদ বেয়ে কিনশাশা অবধি আসব স্টিমারে, যদি যেতে পারি। ফিরে এসে লিখব আমার বাঙালী পাঠক-

পাঠিকার জন্যে, যাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন খুব ; অথচ যাঁরা যেতে পারেন না কোথাও।

ভাবলে যেমন আনন্দ হয়, তেমন দুঃখও হয় যে, বাঙালী সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত সমস্তর কদর করেন কেবল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালীরা। বাঙালী, বড়লোক হলেই ইঙ্গবঙ্গ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার এত বছর পরেও এমন দুর্দৈবর কথা ভাবা যায় না।

কেনীয়া আর তান্‌জানিয়াতে ট্রপিকাল জঙ্গল আছে, তবে খুব কম। সাভানা গ্রাস ল্যাণ্ডস্ এবং উঁচু পাহাড় এবং জঙ্গল। আফ্রিকার শীতকাল জুন-জুলাইয়ে। গোরোংগোরোতে খুবই ঠাণ্ডা। আরুশাতেও। নাইরোবীতে ত বটেই।

নাইরোবী কথাটার মানে জানো? "নাইরোবী" একটি মাসাই শব্দ। নাইরোবী কথার মানে হচ্ছে, "খুব ঠাণ্ডা"।

আসলে মাসাইদেরই ঘাঁটি ছিল কেনীয়ার নাইরোবী। কিন্তু জার্মান ও ইংরেজদের 'হোম' এর মত আবহাওয়া বলে মাসাইরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এখন ত নাইরোবী মস্ত শহর, কেনীয়ার রাজধানী।

কেনীয়া থেকে তান্‌জানীয়াতে ঢুকে পড়তে কোনো অসুবিধে নেই। একই দেশ, একই বিস্তৃতি, শুধু রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণেই অন্য দেশ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার মত। কিন্তু সম্পর্ক দু রাজ্যের মধ্যে একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। তাই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সরাসরি আসা যায়না। সেশেলেস্

এ রাত কাটিয়ে, তার পর আসতে হবে। এ এক মহা অসুবিধে।

গতবার ফেররার সময় মরিশাস্ দ্বীপপুঞ্জে মাত্র ঘণ্টা খানেক ছিলাম—। এয়ার ইণ্ডিয়াতে আসছিলাম। অভীকের দেওয়া দারুণ সুন্দর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান পাইপটা সীটের সামনের পকেটে রেখে নেমেছিলাম। হাওয়া হয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যে। ধন্য এয়ার ইণ্ডিয়া! নামের আদ্যক্ষরে হাওয়া বলে হয়ত কোনো-কিছুই হাওয়া হতে সময় লাগে না।

মাসাই আর সোয়াহিলী শব্দগুলো কানের আর মাথার মধ্যে কেমন বাজে, ঝুমঝুমির মত। ন্যাশানাল পার্কেরও লেখা-জোখা নেই কেনীয়া-তান্জানীয়াতে। আর কত রকম তাদের নাম। সেরেঙ্গেটি, লেক-মানীয়ারা, সাভো, আরুশা, মাসাই-মারা, টারাঙ্গিরে, উহুরু, রুআহা ইত্যাদি।

"উহুরু" বলে রবার্ট রুয়ার্কের একটি বই আছে। পারলে, পোড়ো। রুয়ার্কের লেখার একটা আলাদা স্বাদ আছে। হেমিং-ওয়ের উপরে কার্লোস বেকারের লেখা—হেমিংওয়ের জীবনী আছে একটি। সেই বইটিও, পারলে পোড়ো। আর হেমিংওয়ের "গ্রীন হিলস্ অফ আফ্রিকা"। মজার এবং ভালো লাগার বই। সেখানে উনি পাহাড়ী মাসাইদের স্তুতি করেছিলেন। হেমিংওয়েকে খুব ভাল লাগে। আর দেশী জগতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রমাপদ চৌধুরীর জন্যেই আজ আমি লেখক।

দেশ ছেড়ে বাইরে এলেই বোঝা যায় পৃথিবীটা কত বড়, অথচ, কত একরকম। চেহারাই শুধু অন্যরকম, কিন্তু সমগ্র

পৃথিবীর মানুষ এক। তাদের চেহারা, রীতিনীতি, ধর্মাধর্ম খাদ্য-খাদ্য পোশাক-আশাক আলাদা হতে পারে, কিন্তু ভিতরে, মূল ভাবাবেগে, কামনা, বাসনা, উচ্চাশায় সব মানুষই এক। এই কথাটা উপলব্ধি করে খুব ভালো লাগে মনে মনে। পল রোবসন্-এর গাওয়া সেই বিখ্যাত গানের দারুণ উক্তিটি মনে পড়ে যায়, সাউথ-আফ্রিকার সাদা সাহেবদের বলতে ইচ্ছে করে ঐ গান গেয়েই যে, "We are in the Name boat brother, if you Sock the one end, you are going to rock the other"

সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে মাত্র চার ভাগে ভাগ করা যায় আমার মতে। ভালো এবং খারাপ। শোষক এবং শোষিত। তান্জানীয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসাদারেরা—তাঁরা যদিও ভারতে অনেকে কখনও আসেননি—সবাই ব্রিটিশ পাসপোর্ট-হোল্ডার—তাঁরা যে ভাবে তান্জানীয়া-কেনীয়ার কালো-কালো গরীব লোকগুলোর রক্ত চুষছেন, তা দেখে একজন ভারতীয় হিসেবে নিজের লজ্জা হয়।

নেপালের ধূলাবাড়ির ব্যবসাদারের মতই ডার-এস-সালাম্-এর ব্যবসাদার এবং ন্যু-ইয়র্ক, লান্ডান, প্যারিস, ব্রাসেলস্, কোলকাতা এবং পৃথিবীর সব জায়গার বানীয়ারা প্রায় একই রকম। সামান্য ইতর-বিশেষ মাত্র। তফাৎ কিছু নেই। তাদের অদৃশ্য অঙ্গুলী-হেলনে তারাই ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। পতন হয়েছে, শুভ-বুদ্ধির, ন্যায়ের, সদ্ভাবের, শ্রদ্ধার, সততার।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে তারাই সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষের।

এটা বড় দুঃখের।

কালকেই ভোরে রওয়ানা হবো কেনীয়ার সীমান্তে লোবো লজ-এর উদ্দেশ্যে। গতবার ওদিকে যাওয়ার সময় হয়নি। খুব ভোরে উঠে সারাদিনের মত তৈরী হতে হবে।

এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। সেশেলস্ থেকে ফেরার সময় একটি পছন্দসই প্রেজেন্ট কিনব তোমার জন্যে। খুব সম্ভব, পারফ্যুম। তোমার শরীর সুগন্ধি হবে; সুগন্ধি হবে আমার কটুগন্ধী স্বপ্ন।

ভালো থেকো।

—ইতি, তোমার বুদ্ধদেব দা

কলকাতা

মহুয়া, আমার মহুয়া,

প্রৌঢ়ত্বর প্রথম-প্রহরে পা রেখেছি আমি। জীবনের দীর্ঘ ধূলিমলিন পথে, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ঈর্ষার কাঁটায় চলে চলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। হৃদয়ের সব সততা ও আবেগ দিয়ে ভালোবেসেছি মানুষকে, বদলে পেয়েছি অভিনয়, শঠতা এবং হৃদয়হীনতা।

সেদিন তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যখন বলেছিলাম যে, সত্যিই বড় কষ্ট হয় আজকাল তোমার কাছে আসতে; জানিনা, সেদিন আমার কষ্টের স্বরূপ কতখানি তুমি বুঝেছিলে!

বলেছিলে, মঙ্গলবার ফোন করবে।

আমি জানতাম যে তুমি করবে না। গত বারো বছরে ন্যূনতম ভদ্রতা বজায় রাখতেও মানুষ যেটুকুও ভালো ব্যবহার করে, সেটুকুও তুমি করোনি আমার সঙ্গে। তবুও তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এসেছি, ভালোবেসেছি। কারণ, না-বেসে পারিনি। ভুল করে, ভুল জনকে ভালোবেসেছিলাম, জীবনের ভুল সময়ে তার মূল্য দিচ্ছি জীবন ভর, জীবন দিয়েই।

তোমার কাছে যত কষ্ট করেই যাই না কেন, তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটও কথা বলার সুযোগ পাই না। বলতে পারি না। মজিদ, নিশীথ, অনুপম, নিরুপম, যম, জহ্লাদ, রাবণ, দুর্যোধন, তারকা, হিড়িম্বারা সব ঘর-জুড়ে বসে থাকে। তোমার মধ্যে

যেটুকু সাহিত্য-প্রীতি, গভীরতা, আত্মমগ্নতা, ব্যক্তিত্ব, আমার মনের মত করে গড়ে তুলেছিলাম তোমার বিয়ের আগে, তার চিহ্নমাত্র আর তোমার মধ্যে অবশিষ্ট দেখিনা। চোখে জল আসে। তোমার মিষ্টি ব্যবহারটুকু ছাড়া, পুরোনো তুমির কিছুই বাকি নেই তোমার মধ্যে। ইলেক্‌শনে-দাঁড়ানো মানুষের মত অহেতুক আজেবাজে লোকের কাছে দুর্বোধ্য জনপ্রিয়তার কামনা তোমার মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। একদিন, জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন নিজে আয়নার সামনে দাঁড়াবে, তখন বুঝতে পারবে কী আশ্চর্য হেলা-ফেলায় নিজের একটাই জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছো!

আমি বুঝেছি চিরদিনের মত যে, তোমার জীবনে আমার আর কোনো জায়গা নেই। আমি তোমাকে আর কখনও কোনো বই দেবো না, তোমার কাছে যাবো না, চিঠি লিখব না, ফোনও করব না। কারণ এক তরফা, এক জনের চেষ্টায় কোনো সম্পর্কই এ পৃথিবীতে রাখা যায়না। তুমি যখন চাওনা তখন থাকবে না। যা গড়ে উঠেছিল তিল তিল করে হাসি-কান্নায়, মানে-অভিমানে, আনন্দে-কষ্টে সুখে-অসুখে।

আমার ছুটি হয়ে গেছে জানি। তাতে দুঃখ নেই। দুঃখ হয় এই বয়সে, এই স্বাস্থ্যে, এই ব্যস্ততার মধ্যে এত অসুবিধার ভীড়ে নতুন করে অপমানিত হতে। যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমার এত অনীহা, এতই উদাসীনতা, এতদিনও এত সুখ-দুঃখ ভুল-বোঝাবুঝির পর ঠিক-বোঝাবুঝির পরও, সে সম্পর্ক আমার পক্ষে

জোর করে রাখতে যাওয়াটাই অসম্মানের। তাছাড়া, আমার বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভবও। তোমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছাড়া এ সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা আর সম্ভব হলো না।

আমি তোমার কেউই নই। কেউ ছিলামও না। এবং তোমার কাছে কিছু স্থূল আর্থিক সাহায্যকারীছাড়া আমার দাম ছিলো না কোনো কালেই। পার্থিক এবং জাগতিক জিনিসই তুমি ভালো বুঝেছো চিরদিন। যা অপার্থিব, যার দাম এক জীবনে শোধ করা যায়না, সেই প্রাপ্তির মূল্য দেওয়া দূরের কথা, সেই প্রাপ্তির স্বরূপ বোঝার মত মনের গভীরতা তোমার সত্যিই কি ছিল? কখনও? যতটুকু বা ছিল, আজ যে তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই, ক্রমাগত ভীড়ে আর লোকসমাগমে আর অর্থহীন বাক্যালাপের ঘনঘটাতে তাতে আমার কণামাত্রও সন্দেহ নেই।

তোমার আজকের মানসিকতার যারা শরিক তেমন সব মানুষই তোমার আজকের বন্ধু হতে পারে। এত দামী, এত চোখের জলের, এত বদনামের ভালোবাসা, এত গভীর যন্ত্রনার প্রেম, তোমাকে যে কেউ কখনও দিয়েছিল এত দুঃসাহসী ঝুঁকির ভালোবাসা, এ কথা ভেবে একদিন তুমি নিজেই শিউরে উঠবে।

সেদিন নিজেকেই জিগগেস কোরো, আমার সঙ্গে তুমি কি ঠিক ব্যবহার করেছিলে?

আমি আর কদিন বাঁচব। ঘোড়ার মত জীবনে দাপিয়ে

বেড়াচ্ছি। পড়ব আর মরব। তখন তুমিএকটু সময় করবে হয়ত একদিনও নয়, একবেলাও নয়, হয়ত এক-আধ ঘণ্টা দরজা-বন্ধকরে একা ঘরে বসে বোঝাবার চেষ্টা করবে তোমার কি ছিল। আর কি হারিয়েছে। না-হারালে, তোমার মত মানুষেরা কি ছিল যে, তার হিসেব পর্যন্ত বুঝতে পারে না।

তোমার সঙ্গে বাইরে অনেক জায়গায়ই যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে অনেক কিছুই করে, কিন্তু উপায় কি? তোমাদের মত মানুষেরা আর তোমার কাকার মত কিছু স্বার্থপর চক্ষু-লজ্জাহীন অথচ ভণ্ডরাজ বুড়োরাই ত এই সমাজ গড়েছে। ঘোমটার তলায় খেমটা নাচলে এখানে দোষ হয়না—যত দোষ সহজ সরল সৎ গভীর হৃদয়াবেগের সীনসীয়ার ভালোবাসায়। ছিচকে চুরি দোষের নয়, শুধু ডাকাতি করা ঘোরতর অন্যায়। আমি যে চিরদিনের ডাকাত। চোরদের আমি ঘেন্না করি। আমি পৃথ্বীরাজ আমি শ্বেতকেতুর মাকে-নিয়ে-যাওয়া ব্রাহ্মণ। বেশ্যালয়ে গমনে দোষ নেই কোনো, ভালোবেসে পরম যতনে কারো শরীর চাইলে মহাপাতকের অপরাধ।

ধিক্ তোমাকে আর তোমাদের সমাজকে আর তোমাদের ভণ্ডামিকে। ধিক্ তোমার স্বামীর ভেলুয়া ভ্যাগাবণ্ড দাদাকে—ধিক্ এই সমাজের অসৎ মিথ্যাচারী লুকিয়ে-পাপাচারী বেশ্যাগমনকারী মানুষগুলোকে।

আমার বয়স হয়ে গেছে। অনেক সয়েছি। প্রতীক্ষারও কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তোমার কাছ থেকে অনেক

পেয়েছি, বদলে আর কিছুর প্রত্যাশা নেই। যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তুমি ভীত, যে-সময়ে তোমার বন্ধু-বান্ধব, অর্থ-যশ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে মানুষজন, বাপের বাড়ি এবং তোমার আজকের কেউ-কেটা ভাইরা, তোমার চন্দ্রহার মুকুটমণি সেই সময়েই, একসময়ের তোমার একমাত্র শুভার্থী, একমাত্র কাছের মানুষ ঋজুদাকে খুব সহজে ফেলে দেওয়া যায়। এবং দিয়েছো।

রাগ কোরো না। সত্যি কথা সবসময়েই শুনতে খারাপ লাগে। আমি জানি যে, তুমি বলবে সত্যি কথা তুমিও বলতে পারো। কি বলতে পারো তাও জানি। কিন্তু সেখানেই মস্ত ভুল তোমার। তুমি যা সত্যি ভেবে বলবে, তা সত্যি নয়। এবং এতদিনেও এ সত্যটা যে তুমি বুঝতে পারলে না এই কথাটা ভেবেই কষ্টে বুক ভেঙ্গে যায়। ছিঃ। ছিঃ। যে আমার ভালোবাসা পেল তার এতটুকু বুদ্ধিও কি নেই ?

আমাকে নিয়ে বাকি জীবনে তোমার আর কোনো সমস্যা হবে না। কখনও তোমাকে দেখেও চিনতে না-পারলে দুঃখিত হয়ো না। যদি দুঃখ পাও, তখন জানবে যে, তুমি আমাকে যা দুঃখ দিয়েছো সমুদ্রের মত, তার তুলনায় তোমার পাওয়া দুঃখ একবিন্দু নোনা জলমাত্র।

ভগবান তোমার ভাল করুন। তোমার স্বামী-পুত্র-ঘর-ভরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অর্ধপরিচিত, অপরিচিত—একদিন তার বাকি নেই কিছুই। রবাহুত, অনাহুত, গন্ধ-আহুত, সঙ্গীত-শ্রুত কিছু গোলমেলে মানুষের মধ্যে এবং সকলের সান্নিধ্যে

প্রায়-সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত যে ঘৃণীত-গণ্ডগোলকে তুমি সুখ বলে জেনেছো, তার মধ্যেই থাকো, পচে মরো, মৃত হয়ে প্রশ্বাস নাও এবং নিঃশ্বাস ফেলো।

তোমাদের মত সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন মড়াদের বাসভূমির নামই কোলকাতা। জীবন কাকে বলে, বাঁচার মানে কি, তার কিছুই তোমরা জানো না। তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, অনুকম্পা হয়। কিন্তু কি করব ?

কিই বা করতে পারি আমি !

পরের ইলেকশানে তুমি কোনো ডাকসাঁইটে পার্টির টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো। নইলে, তোমার এই বিপুল জনপ্রিয়তা কোনো সৎকাজেই লাগবে না। যারা সচরাচর রাজনীতি করে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি তোমারই মত। অনেক স্তাবক হবে, কাউকে সিমেন্টের পারমিট দেবে, কাউকে টিনের, কারোর ছেলের চাকরী দেবে, কাউকে থানায় নিয়ে গিয়ে বারংবার পুলিশ দিয়ে পেটাবে —যা তুমি জানো, বোঝো। কিন্তু তুমি আমার মত কারো ভালোবাসা পাবেও না, কাউকে ভালোবাসতেও পারবে না। কারণ কি জানো ? কারণ ভালোবাসা ইলেকট্রিসিটির মত। নেগেটিভ ও পজিটিভ জড়াজড়ি করলে, ঠোঁটে-ঠোঁট ছোঁওয়ালে আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলো জ্বালাবার ক্ষমতাকে স্টোর করে রাখা যায় না কোনো ভাঁড়ারে, পৃথিবীর কোনো হিমঘরেই। ভালোবাসা আলু অথবা চিংড়িমাছ নয়। তুমি আমার ভালোবাসা তোমার মনের ডিপ-ফ্রিজে ফ্রিজ করে

রাখতে চাও, পুরুষ-শিভাল হরিণের লাল, তাল-তাল ভেনিসনের মত। যাতে, ইচ্ছে ও অবসর মত বের করে কুরে কুরে খেতে পারো নানারকম সস্ ও চেরী দিয়ে রম্‌রমে করে রেঁধে! সে গুড়ে বালি!

মহুয়া, ভালোবাসা ধরে রাখা যায় না। যখন সে মনের তার বেয়ে চকিতে আসে তখনই তাকে জায়গা করে দিয়ে আদরে, শরীরে—মনে পুলকভরে গ্রহণ করে সম্পৃক্ত শিহরিত মর্মরিত হতে হয়। আশ্লেষ থেকে আশ্লেষে। আনন্দ থেকে গভীর দুঃখে এবং গভীর দুঃখ থেকে আনন্দে ঝুলার ঝুলনের মত অঙ্গাঙ্গী হয়ে দুলতে হয়। তুমি অভ্যাসের, লোকভয়ের দাসী হয়ে গেছো। ভালোবাসা তোমার জন্যে!

এসব বলেই বা লাভ কি তোমাকে? এত কথাই যদি বুঝবে, তাহলে ত আমার ভালবাসার মূল্যও বুঝতে!

তার চেয়ে তুমি ইলেকশনেই দাঁড়াও।

ভোট দেবেন কাকে? মহুয়া চৌধুরীকে।

ভোট দেবেন কেন?

মেয়ে নেই, মহুয়া চৌধুরী হেন।

মহুয়া চৌধুরী লক্ষ জনের প্রিয়।

যুগ যুগ জীও, যুগ যুগ জীও।

ইতি তোমার

বুদ্ধদেবদা

কলকাতা

মহুয়া,

একজন রাজা ছিলেন আর একজন মন্ত্রী। যাই-ই ঘটুক না কেন, মন্ত্রী বলতেন, ভগবানে যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। মন্ত্রীর এ হেন নির্বিচার ভগবান বিশ্বাস দেখতে দেখতে রাজা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

একদিন রাজার আঙুলের (তর্জনীর) ডগাতে একটি ফোঁড়া হল। রাজা বললেন, দেখছো মন্ত্রী! মন্ত্রী বললেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

পরদিন ফোঁড়াটা পেকে ফুলে লাল হয়ে উঠল। বৈদ্য ডাকা হল। রাজা যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করে বললেন, দেখছো মন্ত্রী! মন্ত্রী রাজাকে প্রবোধ দিয়ে আবারও বললেন, ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যে।

দিনকয়েক পর বৈদ্য রাজার তর্জনী কর্তন করে দিলেন, ফোঁড়ার অবস্থা এমনই বেহাল হয়ে গেছিল। রাজা তর্জনী হারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, দেখছো মন্ত্রী! আমার কী সর্বনাশ হল। মন্ত্রী তবুও বললেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

এর কিছুদিন পর রাজা আর মন্ত্রী গেছেন শিকারে। মনে মনে রাজার রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে মন্ত্রীর উপর। একেবারে

বিরক্ত। শিকারে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে, অনেক ছলনা করার পরও কোনো শিকার পাওয়া গেলো না। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দুজনে একটা শুকনো কুঁয়ো দেখতে পেলেন জঙ্গলের মধ্যে। রাজা আর মন্ত্রী যখন ঝুঁকে পড়ে কুঁয়োটা দেখছেন তখন রাজা এক ধাক্কা দিয়ে মন্ত্রীকে ফেলে দিলেন কুঁয়োর মধ্যে। মন্ত্রী পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারলেন না। রাজা বললেন, কি মন্ত্রী? থাকো সারারাত এই কুঁয়োর মধ্যে! কাল লোক পাঠাবো তোমাকে তোলার জন্যে। মন্ত্রী বললেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

মন্ত্রীকে ফেলে দিয়ে রাজা যখন একা একা ফিরে যাচ্ছেন, যেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা অপেক্ষা করছেন ঘোড়া ও খাবার-দাবার নিয়ে। কিন্তু ফেরবার পথে রাজার পথ ভুল হয়ে গেল জঙ্গলে এবং তিনি গিয়ে পড়লেন জংলীদের খপ্পরে। এমন জংলী লোক যারা নরবলী দিয়ে দেব দেবীর পুজো করে। রাজাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে দুহাত বেঁধে সিঁদুর মাখিয়ে একেবারে বলির জন্যে তৈরী করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাদের মন্দিরে নিয়ে চলল বলি দেবে বলে। কিন্তু মন্দিরে তাদের পুরোহিত রাজাকে সামনে বসিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, রেগে, চেঁচামেচি করতে লাগল। তখন অন্যরা দেখল যে রাজার তর্জনী কাটা। যে মানুষকে বলি দেওয়া হবে তার ত কোনো খুঁত থাকলে চলবে না—বনের দেবতা তাতে সেই জংলীদের উপর রুষ্ট হবেন খুব।

তাই তারা হৈ হৈ করে রাজাকে ছেড়ে দিল। হাতের বাঁধন খুলে।

রাজা প্রাণ নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে অন্ধকারে কোথায় সেই কুঁয়ো, তা খুঁজতে খুঁজতে চললেন আর ভাবতে লাগলেন মন্ত্রীতো ঠিকই বলেছিলেন ঃ ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। তাঁর তর্জনীতে যদি ফোঁড়া না হত, আর যদি কাটা না যেত তা বৈদ্যের হাতে, তবে ত আজ তার জীবনই চলে যেত।

অনুতপ্ত হয়ে, খুঁজতে খুঁজতে তিনি কুঁয়োটি দেখতে পেলেন। কুঁয়োর কাছে এসে পাশের বটগাছের ঝুরি টেনে এনে নামিয়ে দিলেন কুঁয়োর মধ্যে। বললেন, মন্ত্রী! আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মন্ত্রী লতা ধরে উপরে উঠে এসে বললেন, না মহারাজ! অন্যায় কিছুই হয়নি। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে।

রাজা বললেন, সে ত আমার প্রাণ বাঁচল বলে বুঝতেই পারছি কিন্তু আমি তোমাকে কুঁয়োয় ফেলাতে তোমার কি মঙ্গল হল।

মন্ত্রী বললেন, আমরা যদি দুজনে একসঙ্গে থাকতাম, এবং জংলীদের হাতে ধরা পড়তাম, তাহলে ওরা আমাকে নিশ্চয়ই বলি দিত দেবতার কাছে, আমার ত আর কোনো খুঁত ছিলো না। তাইই ত সবসময় বলি ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। সবসময় সকলেরই জানা উচিত যে, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে।

একজন পশ্চিমবঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, একটি খল, ধূর্ত, ইতর মানুষ আমার মক্কেল সেজে আমার কাছে এসে, আমাকে তিনমাস ১২।১৪ ঘণ্টা করে খাটিয়ে আমার হার্ট-এ্যাটাক করিয়ে তারপর ন্যায্য ফিস দেওয়া দূরস্থান, আমাকে অপমান করে চলে গেল। একেও ভগবানই পাঠিয়েছিলেন।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সে তার মঙ্গলের জন্যে আমার কাছে এসেছিলো, নীচ মানুষ। সেই মঙ্গল আমি তার সাধন করে দিয়েছি। বিবেক এবং ভগবানের কাছে আমি পরিষ্কার। এখন ভগবানই তাকে যা করার করবেন। সে আমাকে যা শেখালো, তাও ভগবানেরই শেখানো এবং তাকেও ভগবানই শেখাবেন, যা তিনি তাকে শেখানো উচিত মনে করেন।

আমি তাকে সর্বস্বান্ত করতে পারি, তার মত একজন অশিক্ষিত, ইতর, একমাত্র টাকার গর্বে-গর্বিত মানুষকে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ঘোরাতে পারি—যে ব্যবহার তুমি আমার সঙ্গে করেছো সেই কারণে; কিন্তু আমি কারও ক্ষতি করিনি জীবনে। আমার কর্ম আমি করেছি। তোমার কর্ম তুমি। আমাদের নিজ নিজ কর্ম আমরা সারা জীবনই করে যাব।

কারণ, না-করে উপায় নেই।

করে যাব—এমনি করেই।

একজন ঋষি নদীতে চান করছিলেন। এমন সময় দেখেন একটা বিছে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে—তক্ষুনি জলে ডুবে মরবে।

উনি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে বিছেটিকে তুলে নিলেন। যেই হাতে নিয়ে জল থেকে তুললেন, অমনি বিছেটা তার হাতে কামড়ে দিল। কামড়ে দিতেই, যন্ত্রনায় তিনি হাতের ঝটকাতে ফেলে দিলেন।

বিছেটা আবার ভেসে যেতে লাগল। উনি আবার বিছেটাকে তুলে নিলেন।

আবার কামড়াল বিছেটা।

আবারও হাত ঝাড়তে বিছেটা পড়ে গেল।

এমনি করে চারবার কামড়াবার পর উনি তবুও বিছেটা পঞ্চমবার জল থেকে তুলেই বাঁচাবার জন্যে পাড়ে ছুঁড়ে দিলেন।

মাটি পেয়ে, বিছেটা জঙ্গলে চলে গেল।

ঋষির সঙ্গে একজন শিষ্য ছিলেন। তিনিও চান করছিলেন নদীতে। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে উনি বললেন, গুরুদেব, আপনি বার বার কামড়ানো সত্ত্বেও কেন বিছেটাকে এতবার জল থেকে তুললেন? দেখুন ত আপনার হাতটার কি অবস্থা হয়েছে। আমি না হয় আপনার শুশ্রূষা করব, কিন্তু এমন করতে গেলেন কেন?

ঋষি হেসে বললেন, ওর কাজই কামড়ানো। ও বার বার কামড়েছে। আর আমার কাজ ওকে বাঁচানো। আমি বার বার ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।

তারপর বললেন, বুঝলে বৎস। সংসারে নানারকম ধর্মের জীব হয়। এই বিছের ধর্ম নিয়ে যারা আসে, তারা কেবল

কামড়ায়ই। আর ভালো করার ধর্ম নিয়ে যারা আসে, তারা সেই বিছেকেই বার বার বাঁচিয়ে যায়।

সংসারে যার যেরকম কর্ম, সে সেইরকম কর্মই করে। ও বার বার কামড়েছে বলে আমি ত আর বিছের ধর্ম আচরিতে পারি না। রাঢ়ভূমের আজীব জানোয়ার, মস্ত টাকাওয়ালা লোকটি বিছে। বিছের ধর্মই তার ধর্ম। তাইই তাকে আমি বাঁচিয়ে ছিলাম।

তবে তার ধর্মের লোকই সংসারে বেশী। তারাই তাকে কামড়ে ছিঁড়ে খাবে যে সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই। সে বিছে ; বিছেই থাকবে।

পাটনা

মহুয়া,

এবারে পুজোর পর, বর্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার শৈলেন মুখার্জীর ছেলে কাজল মুখার্জী, বীরভূমের আহুড়িয়া বাংলো বুক করেছিলেন আমার জন্যে।

কনসার্ভেটর, দার্জিলিং-এর বর্ধন রায় সাহেব বুক করে-ছিলেন খুঁটিমারি ও চাপড়ামারি। কিন্তু শেষমুহূর্তে যাওয়া হলো না। সোনাইয়ের বাবার শরীর খুবই খারাপ হল। হায়দ্রাবাদে ট্রাঙ্ককল করে সোনাইকে আনিয়ে নিউ আলিপুর পৌঁছলাম।

অষ্টমী ছিল সেদিন। মনোজকে সঙ্গে নিয়ে আহুড়িয়াতে গরমের মধ্যে অতি খারাপ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে গিয়ে—শেষে আউসগ্রাম ও ওসকরা হয়ে ফিরেই আসতে হলো সিঙ্গুর। পূর্ণর ডেরায় সিঙ্গুরে সিদ্ধির শরবৎ আর খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে থেকে, পরদিন একেবারে ভাঙা মনে ফিরে এলাম কোলকাতাতে। আহুড়িয়ার জঙ্গলকে জঙ্গল বলে না। জঙ্গল না-থাকলেও ক্ষতি ছিলো না, যদি জায়গাটা নির্জনও হতো। সামনে ধানক্ষেত।—একটা গর্তের মধ্যে বাংলোটা। কাজলের দোষ নেই। তার আন্তরিকতার অভাব ছিলো না। দোষ বাংলোটার। এবং জঙ্গল সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার।

মনের দুঃখে দুদিন শুয়ে থেকে কোলকাতায়, জোর করেই বেরিয়ে পড়লাম বিজয়া দশমীর পরদিন ভোর বেলা গাড়ি নিয়ে—। মনোজকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

বারিপদাতে গেলাম প্রথমে। কিন্তু শুনলাম সারা উড়িষ্যাতেঃ অফিস-কাছারি নাকি বন্ধ লক্ষ্মীপুজো অবধি। ভেবেছিলাম ডি-এফ-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কোনো জঙ্গলের. বাংলোর রিজার্ভেশান নেব। তাও হলো না।

হাইওয়েতে, পথে একটি ধাবাতে রুটি-তড়কা খেয়ে নিয়ে চলে এলাম বাংরিপোসিতে। সেখানে এখন বড় করে ওড়িশা ট্যুওরিজম্-এর বোর্ড লেগেছে। মাউসীর সঙ্গে দেখা হলো। সে জানতো না যে তাদের "বাংরিপোসির দু রাত্তির" কত বিখ্যাত করে দিয়েছে। ঐ বাংলো কোলকাতার কোন লোক পনেরো তারিখ অবধি রিজার্ভ করে টাকা পাঠিয়ে রেখেছিলেন। তাই মাউসী বলল যে, সন্ধ্যেবেলার আগে বাংলো খোলা যাবে না। তাই ভাবলাম সময়টুকু অন্যত্র কাটিয়ে আসি।

যখন বিসোই'র দিকে যাচ্ছি, তখন পথে দেখা হল বাংরিপোসির দ্বিতীয় চৌকিদার গুর্‌বার সঙ্গে।

সে বলল কোলকাতার বহু লোক এসে তাদের কথা জিগগেস করেছে—বাংরিপোসির দুরাত্তির বই পড়ে।

ওকে মুর্গী কেনার টাকা দিয়ে—ঘাট পেরিয়ে বিসোইতে চলে গেলাম।

বিসোই ইন্‌সপেক্‌শান বাংলোটিও সুন্দর। তবে আমার

বাংরিপোসি বেশী ভাল লাগে। বিসোই জায়গাটিকে অবশ্য খুবই ভাল লাগে। এত ভালো খুব কম জায়গাকেই লাগে—এখানে জমি পেলে একটি ছোট্ট বাংলো বানাতাম।

বিকেলে বিসোই থেকে ফিরেই এলাম বাংরিপোসিতে।

আগামীকাল লক্ষ্মীপূর্ণিমা। চান-টান করে বাংলোর বারান্দাতে বসলাম। আকাশে মেঘ ছিল। সামান্য বৃষ্টি হল। তারপর চাঁদ উঠল। বাংলোর সামনে বড় অশ্বত্থ গাছটা এবং ক্ষীরকুঁড়ি গাছ এবং অন্যান্য গাছ থাকায় জ্যোৎস্না ভাল পড়ে না। তাই গাড়ি নিয়ে বাংরিপোসির ঘাটের ঠিক নীচে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মনোজের সঙ্গে হুইস্কি খেলাম।

এখন হাতির ভয় খুব। ধান পেকে এসেছে প্রতি ক্ষেতে ক্ষেতে, উপত্যকায় আর মালভূমির মাইলে মাইলে। প্রতি ক্ষেতে লোক জাগছে, গাছের উপর মাচা করে, অথবা যেখানে গাছ নেই, সেখানে ধানক্ষেতেই ; খড়ের ছোট ঝুপড়ি বানিয়ে হাতি পাহারা দেবার জন্যে। তাদের কারো গান বা বাঁশীর আওয়াজ রাত-চরা পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে কাছে—দূরে থেকে। নেশা লেগে যায়।

কোথায় কোলকাতা!—অথচ এত কাছে এই সব জায়গা কোলকাতা থেকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার তফাৎ।

কোলকাতার লোককে নিছক বেঁচে থাকবার জন্যেই প্রাণ, মন ও শরীরকে সঞ্জীবিত করে রাখার জন্যেই এই সব জায়গায় আসতে হবে। একদিন।

কেন যে এখনই আসেন না তাঁরা, তাঁরাই জানেন। তবে শিক্ষিত লোকেরা মাউসী ও গুর্‌বার যা ক্ষতি করার তাইই করে চলে যান। কোলকাতার এক ডাক্তার নতুন লাগানো ফ্রিজ-এর স্ট্যাবিলাইজারটি বিছানার ভিতর পুরে নাকি চলে এসেছিলেন। অনেক লোক নিয়ে গেছিলেন তাঁরা মেয়ে-মদ্দ, বাচ্চা কাচ্চা। মাউসী দয়া করে থাকতে দিয়েছিলো তাদের। কারণ, নিয়ম নেই দুজনের বেশী এক্ঘরে থাকার।

সেই ভালো ব্যবহারের এই পরিণাম। বড় শহরে থাকতে থাকতে বেশীর ভাগ মানুষই চোর-ছ্যাঁচোড় হয়ে যায়।

ভাবলেও খারাপ লাগে।

অনেকক্ষণ সেই শিশিরে-ভেজা চাঁদের আলোয় ভিজে, নিজেকে পাখির ডাকে আর হাতির আসার সম্ভাবনার আনন্দে শিহরিত করে ফিরে এলাম বাংলোতে। মুরগীর-ঝোল আর সেই "কিশা-অরি-পিকুর" ভালোলাগার শুকনো লংকা-দেওয়া আলুভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম নানা পাখির ডাক শুনতে শুনতে।

অশ্বথগাছের ডালে ডালে লাল ফল এসেছে। ভোর বেলাতে পাখিদের মেলা সেখানে। রোদে চেয়ার টেনে বসে ভালোবেসে পাখিদের দেখতে দেখতে বেলা অনেক হল। মনোজ-মাস্টার ফারস্ট্‌-ক্লাস চা নিয়ে এসে ব্রেকফাস্টের ইন্তেজাম করতে লেগে গেল। ও চানও করে নিলো।

আমি বললাম, চলো, ঘুরে আসি, ফিরেই করব।

পরোটা, আলুভাজা ডিম-ভাজা আর পাঁশকুড়ো থেকে আনা চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে কান্‌চিনডা বাংলোর পথে চললাম গাড়ি নিয়ে। কান্‌চিনডা বাংলো সিমলিপালের ভিতরে। রিজার্ভেশানও করতে হয় যোশীপুর থেকে। কিছুদূর পথটা ঘুঘুডাকা আর ছোট-ছোট পুকুর ভরা ছায়াঘেরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বুড়াবালাং নদীর কাছে পৌঁচেছে। তারপর কান্‌চিনডা বাংলোর এক কিলোমিটার মত আগে, বাঁদিকে এক বিরাট গভীর দহ-এর সৃষ্টি করেছে। নীল জল। সেই দহ থেকে আবার চলকে গিয়ে নদীটা বয়ে গেছে সমতলে।

কান্‌চিনডা বাংলোর আগে ফিয়াট্‌ গাড়ি পেরুতে পারে এমন উপায় নেই। স্পেশ্যাল গীয়ার না-থাকলে এবং জীপ না হলে নুড়ি-ভরা নদী ও চড়াইটার শেষভাগ পেরুনো খুবই মুশকিল।

আমি গাড়ির কাছেই রইলাম। মনোজকে বললাম যে, তুমিই গিয়ে বাংলোটা দেখে এসো। কান্‌চিনডাতে থাকিনি কখনও আমি। ও দুজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে বাংলোটা দেখে এল। "মনোজ" নামেরই একটি মুণ্ডা ছেলেকে পাঠালাম। আমাদের "মনোজের" দেরী দেখে। সেই মনোজ, সাইকেলের ক্যারীয়ারে বসিয়ে আমাদের "মনোজকে" নিয়ে এল। "মনোজের" সঙ্গে "মনোজের" মনের মিল ত হবেই।

গাড়িতে জায়গা আছে দেখে একটি চামুণ্ডি-মুণ্ডা ছেলে আমাদের সঙ্গে বাংরিপোসি অবধি লিফ্‌ট চাইলো। সেখান

থেকে বাসে করে চলে যাবে বাহাল্‌দা না মানাদা কোথায় যেন।

বাংলোয় ফিরতে ফিরতে আমাদের আড়াইটে হয়ে গেল। খেয়ে উঠতে উঠতে সাড়ে-তিনটে। খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। একজন লম্বা কালো-চশমা পরা ভদ্রলোক। দোহারা চেহারা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। খুব জোরে জোরে কথা বলছিলেন।

গুর্‌বা ছিলো না—।

মনোজকে জিগগেস করলেন, চৌকিদার কোথায়?

মনোজ মাউসীর ঘর দেখিয়ে দিলো ওকে।

মেয়ে মানুষ দেখে, ভদ্রলোক মাউসীকে বললেন, চৌকিদার কোথায়?

মাউসী তার ওড়িয়াতে কি বলল তা বোধহয় ভদ্রলোক বুঝলেন না। খুব চেঁচিয়েই কথা বলছিলেন উনি। এবং দেখলাম, ওড়িয়া একেবারেই জানেন না। তাই, আমি মনোজকে পাঠালাম ওঁকে সাহায্য করতে।

ভদ্রলোক বিহারের এক ছোট্ট শহরে চাকরী করেন। তাঁর এক ছেলেও চাকরী করে। মেয়ে এখনও পড়ে। বিয়ে বাকি। রিটায়ার করবেন মাত্র তিনমাস পরে। ওঁর স্ত্রী ওঁকে বলেছেন, রিটায়ার করলে ত পেনসান্‌-এর টাকায় আর বেড়ানো চলবে না, তাই শেষবারের মত বেড়িয়ে এসো। উনি চাঁদিপুর ঘুরে, এখানে এসে পৌঁছলেন এই লক্ষ্মীপূর্ণিমার সন্ধ্যেবেলাতে।

এখানে বড়াইপানি ফলস্ দেখবেন সিমলিপালের—। কাল সকালের বাসে যোশীপুরে যাবেন। কানে ভদ্রলোক শোনেন খুবই কম। বাঁ কানে একদমই শোনেন না। শুনলাম, সমরেশ বসু সাহিত্যিকের বাল্য বন্ধু। হবেন। নাও-বা হবেন। সমরেশদাকে আমি চিনি। যশস্বী সাহিত্যিক-টাহিত্যিকদের আমি সমীহ করি ; দূরে থাকি। হয়ত, নিজে কখনও যশস্বী হবো না বলে কিঞ্চিৎ ঈর্ষাও বোধ করি !

ভদ্রলোক বললেন, সামর্থ্য থাকলে আরও কদিন থেকে যেতেন এ সব জায়গায়। মাত্র পঞ্চাশ টাকা সঙ্গে আছে তাই দিয়ে বড়াইপানি দেখতেও চান,—যেখান থেকে বুড়া-বালাং নদীর জন্ম।

মনোজকে দিয়ে, আমি ওকে বললাম যে, রাতে আমাদের জন্যে খিচুড়ি হচ্ছে—মাউসী, গুর্বা ওরা সকলেই খাবে ; তাই উনিও আমদের সঙ্গেই খাবেন—আলাদা আর কেন শুধু শুধু পাউরুটি ডিম-সেদ্ধ খেয়ে থাকবেন ?

তাতে উনি বললেন খাব। কিন্তু পয়সা নিতে হবে।

মনোজ বুঝিয়ে বলল, যে, আপনি এতবড় সাহিত্যিক সমরেশ বসুর বন্ধু। তার ওপর আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমার চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে এলেন—না হয় আমাদের অতিথিই হলেন।

ভদ্রলোককে আমার প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল। ভারী প্রকৃতি-পাগল লোক। ওঁকে নিয়ে একটি গল্প লিখব কখনও। নাম দেব, “বাদামপাহাড়ের যাত্রী”।

উনি বললেন, যা ব্বাবা, অদ্ভুত লোক মশাই আপনারা।

চাঁদ, মেঘে ঢেকে গেলো। আকাশ কালো করে ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি আর জলকণা ভাসানো দম্‌কা-হাওয়া।

আমাদের সকলকে ঘরে গিয়েই বসতে হল। বৃষ্টি থামল ঘণ্টা খানেক বাদে। চরাচর উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল। লক্ষ্মীপূর্ণিমার কোজাগরী চাঁদ। আমরা গাড়ি নিয়ে, ওঁকে বাংরিপোসির ঘাট দেখিয়ে আনলাম। অটোমোবাইল এ্যসোসিয়েশানের বইয়ে লেখা ছিল যে, এই ঘাটে সন্ধ্যেবেলা গাড়ি না-চালানোই ভাল। হাতির উপদ্রব হয়। উনি জানতেন। একটু ভয়ও পেলেন। ওঁর কারণেই আমরা নীচে নেমে এসে ঘাটের কাছে গাড়ি রেখে বাইরে দাঁড়িয়ে হুইস্কি খেলাম। শুধু অটোমোবাইল এ্যসোসিয়েশানের বই কেন? ছাপার অক্ষরে যাই-ই লেখা থাকে, তাইই মিথ্যে।

বড় চমৎকার পরিবেশ। হাতি-তাড়ানো মাচা থেকে গান ও বাঁশীর সুর ভেসে আসছিল। জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছিলো চারদিক। একটি বাচ্চা ছেলে হাতি-তাড়ানো মাচা থেকে নেমে এলো। আমার গান শুনতে। আমাদের জল ফুরিয়ে গেছিল। জলও এনে দিল।

আমাদের এই সুন্দর হতভাগা দেশের পাহাড়-বনের মানুষরা এত ভাল যে, বলার নয়। এরাই আসল ভারতবর্ষ। শহরের মানুষরা কেউই নয়। তারা এক শতাংশও নয়। অথচ তাদের কথা, যারা আসল, যারা দেশের মেরুদণ্ড তাদের কথা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এখনও প্রায় অনুপস্থিত।

পরদিন খুব ভোরে গৌরমোহন ঘোষ, সেই ভদ্রলোক বাস ধরে যোশীপুর চলে গেলেন। আমার একটা কার্ড দিলাম ওঁকে। যোশীপুরের কনসার্ভেটর সরোজ রাজ চৌধুরিকে দেবার জন্যে। যাতে যাওয়ার খরচ নিজে দিলে অন্য অসুবিধা না হয় কোনো।

দুপুরে হাট বসেছিল বাংরিপোসিতে। ঝাঁটা কিনলাম। "ঘইতা পিটিবাকু ঝাড়ু"। মানে বর ঠ্যাঙ্গাবার ঝ্যাটা। সবজী-টবজী কিনলাম। লাল কন্দমূল। অমৃতভাণ্ড। লাল টক-ঢ্যাঁড়স। টক খাবার জন্যে। কাঁসার বাসন। রুপোর বালা। আর পায়-জোড়। তারপর বারিপদা গেলাম তেল নিতে—গুর্‌বাকে বলে গেলাম যে, আমরা ফিরে এসে আড়াইটের সময় খাব, মাউসী যেন রান্না করে রাখে। ওকে আরও টাকা দিলাম মাছ কেনার জন্যে।

বারিপদাতে তেল নিয়ে, চাকার হাওয়া, ব্যাটারীর জল, সব চেক করে যখন বাংরিপোসিতে ফিরলাম তখন প্রায় তিনটে বাজে। ফেরার রাস্তাতে বুড়াবালাং নদী পেরিয়ে আসতে হয়। বড় সুন্দর নদী। ব্যাংকের পাশ দিয়ে একটা রাস্তায় এক কিলোমিটার গেলেও নদীটা পড়ে। বড় সুন্দর দেখায় নদীটা।

ফিরে দেখি, অত বেলায় রান্না কিছুই করেনি। গুর্‌বা নাকি আড়াইটের সময় বাজার দিয়ে গেছে মাউসীকে। মাছও কেনে নি।

বড়ই অভিমান হল। আমি গিয়েই মাউসীকে একশ টাকা বকশিস্ দিয়েছিলাম। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গে গুর্‌বা এবং মাউসীর সমস্ত পরিবার খাচ্ছিল। তবুও ওরা এমন ব্যবহার করল। রাগ করে, না-খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই বাংলো ছেড়ে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম এখানেই ছুটিটা কাটাবো। হলো না। অভিমান বড় ক্ষতি করে মানুষের অথচ মানুষেরই অভিমান থাকে। জানোয়ারের নয়। আমি এত বড় ইডিয়ট যে, চিরজীবনই অন্যের উপর অভিমান করে নিজের নাক কাটলাম।

বিসোইতে চা সিঙ্গাড়া খেয়ে যখন যোশীপুরে এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পি-ডাব্লু-ডি'র বাংলোতে জায়গা নেই। বললেন ওভারসিয়র। বললেন, স্টেট গেস্ট-দের রিজার্ভেশান আছে। চৌধুরি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। একটা হাতি সিমলিপালে খাদে পড়ে গেছিল, তার কালার্ড-মুভি নিয়েছিলেন উনি, সেই ছবি দেখছিলেন তখন। আমাকেও দেখতে বললেন। তারপর ওঁর বাংলোতেই থাকতে বললেন। আমি পি-ডাব্লু-ডি'র বাংলোর কথা বলতে বললেন, ওঁরা জানেন না যে স্টেট গেস্টরা চলে গেছেন জঙ্গল ছেড়ে চাঁদিপুরে। উনি সঙ্গে চাহালার রেঞ্জারকে দিলেন আমাদের সঙ্গে গিয়ে পি-ডাব্লু-ডি'র বাংলো ঠিক করে দিতে। অতএব বাংলো পাওয়া গেল।

ঐ অল্পবয়সী স্মার্ট রেঞ্জার ভদ্রলোক আমার অনেক লেখা পড়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত ওড়িয়াই বাংলা জানেন। অথচ

বাঙালীরা ওড়িয়া জানেন না। এটা লজ্জার কথা। ভদ্রলোকের স্ত্রী কোলকাতায় বাংলা মিডিয়ামে পড়েছেন। তাঁর শ্বশুরমশাই একজন ওড়িয়া লেখক। কে সি দাশ।

সরোজ রাজচৌধুরির মত একজন ডেডিকেটেড ফরেস্ট অফিসার আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায় না। এমন লোক দেশে অনেক দরকার। খাবার ঘর ভর্তি ভাল্লুকের কলা ঝুলছে, নানারকম মিল্ক-পাউডারের কৌটা। আব বসার ঘরে ট্যাঙ্কুলাইজার গান আর ফিল্ম, আর কাগজ আর জন্তু জানোয়ারের লগ-বুক। খৈরীর উপর উনি যা লিখেছেন তার সাইক্লোস্টাইল্ড্ কপি আমাকে দিলেন। পড়বার জন্যে। খৈরীর কবর দেখালেন। সাত-কেজি ওজন কমে গেছে ভদ্রলোকের। খৈরীর শোকে।

যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে সকালে আবার বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এমনি করে বেড়াতেই আমার ভাল লাগে, সঙ্গে মহিলা কেউ না-থাকলে। এ দেশে মহিলাদের নিয়ে বেরুলে অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। এটা দুঃখের। বাদামপাহাড় জায়গাটা ভারী ভালো। ছোট্ট স্টেশন। চল্লিশ ভাগ বাঙালী। বাঙালী মিষ্টির দোকানদার মনোজের কাছে আমার নাম শুনে এসে আলাপ করতে এলেন। মনোজের উপর খুব রাগ হলো। সে কথা ওকে বললামও। পরিচয় জানালেই বেরোবার আনন্দ সব মাটি হয়ে যায়। ইন্‌কগ্‌নিটো না থাকলে ইম্‌পার্‌সোনাল ওয়েতে সবকিছু দেখা যায় না;

শোনা যায় না।

বাদামপাহাড়ে আমার পরিচয় জানাজানি হওয়াতেই আর থাকা গেলো না। চলে এলাম চিরিং। তখন বেলা একটা। একটি মাত্র দোকানে আলুভাজা আর কলাভাজা (রম্ভাভাজা) দিয়ে ভাত খাব ঠিক করে বাংলোতে গিয়ে উঠেছি এমন সময় তিন চারজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির। তাঁরা ওখানে লাঞ্চ করতে এসেছেন, একটি খুনের কেসের তদন্ত করতে যাওয়ার আগে। সেই সুবাদেই মিস্টার মহাপাত্র আর পাধীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার গাড়িতেই গেলাম, বড়্‌ভুণ্ডু। সে এক অভিজ্ঞতা। মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে একটি উপন্যাস লিখব। নাম দেব "সোপর্দ"।

মানুষ যে কি দেখে আমার মধ্যে, তা অন্য মানুষেই জানে। আমি ওড়িয়া বলতে পারি দেখে ও'রা খুব খুশী। সন্ধ্যেবেলা মহাপাত্র সাহেব বাসে করে রাইরাংপুরে চলে গেলেন। রাতে পাধী সাহেবের অতিথি হিসেবে ঐ বাংলোতেই মুরগীর মাংস এবং পরোটা দিয়ে ডিনার সারা হলো চাঁদের আলোতে টেবল লাগিয়ে। তার আগে একটু রাম্ খাওয়া হলো সকলে মিলে। খাওয়ার পর, রাত দেড়টা অবধি হাতি দেখার জন্যে মাকড়িঘাটি এবং বিহার বর্ডার অবধি ঘুরলাম। দেখা গেলো না।

মাতাজীর ঘর আছে বিহার বর্ডারের কাছে। তাঁর যুবতী

মেয়ে কোলকাতাতে এম.বি.বি.এস পড়ে। সেও ছিল।

পরদিন দেখা করতে গেছিলাম মাতাজীর সঙ্গে। তাঁর চেহারায় ও কথাবার্তায় অসাধারণত্ব কিছুই চোখে পড়ল না। মেয়েটিকে দূর থেকে দেখলাম। কাছে যখন গেলাম, তখন ঘরের মধ্যেই রইল। হয়ত আমার ডাকাতের মত চেহারা দেখে ভয় পেয়েছিল। মা কালীর একটি মূর্তি এবং অন্যান্য বিগ্রহ দেখলাম।

দুপুরে নবাব খানের বাড়িতে টিরিং বস্তিতে লাঞ্চের নেমতন্ন ছিল। ঐ গ্রামের শরপঞ্চ্ উনি। সকালের ব্রেকফাস্ট এসেছিল পাধী সাহেবের বাড়ি থেকে। পরোটা আলু আর অমৃতভাণ্ডর তরকারি। সুজির বরফি। চমৎকার।

পাধী সাহেব গেছিলেন পোট্‌কা পোলিস স্টেশনে, কি কাজে। ফিরে আসার পরই সকলে খেতে যাওয়া হলো। মাটির ঘরে বসে পোলাও।—সঙ্গে দু'রকমের মাংস। খাসি আর কুকুড়া। তারপর সুজির ক্ষিরনী। অবশেষে পান খেয়ে গাড়িতে বসলাম।

হাটা-পোট্‌কা; হলুদ-পুকুর, যাদুগোড়া, মোসাবনী, মৌভাণ্ডার, ঘাটশীলা হয়ে হাইওয়েতে এসে পড়লাম।

কোলকাতা ফিরলাম রাত সোয়া নটাতে। আবার ডিজেলের ধুঁয়ো। আবার দমবন্ধ। টেলিফোন। লোকজন। কাজ। অবিরাম কথা বলা। প্রুফ-দেখা। ভালো লাগে না।

ইতি—

বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

কাল গোর্কী সদনে পূর্ণেন্দুর "মালঞ্চ" দেখতে গেছিলাম। চমৎকার লাগল, কিন্তু জায়গায় জায়গায় বড় ধীর। সব মিলিয়ে যেন স্ত্রীর-পত্র আরো ভালো লেগেছিল। রঙিন ছবি বলে রঙিন ফুলের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন পূর্ণেন্দু। কিন্তু বড় গাছের কোনো ব্যবহারই করেন নি। টবের গাছ আর কেয়ারী-করা বাগান কখনোই ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত বড় গাছের পরিপূরক নয়। বিষয় হিসেবে বড় গাছ-গাছালি এমনই এক বিষয় যে, তা ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এই ছবিতে।

টুনটুনীর গান ভাল। যখন রেকর্ডিং হয় তখন ও মায়ের বোঝা বইছিল, তাই দমের কষ্ট ছিল। সেই কষ্টটা গানকে একটা আশ্চর্য ভরাটত্ব দিয়েছে ; মাতৃত্বের মত। প্রথম গান, "একি লাবন্যে পূর্ণ প্রাণে, প্রাণে এসো হে"। দ্বিতীয় গান 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার!' টপ্পার কাজ আছে। কিন্তু সেই সময় পূর্ণেন্দু মাধবীকে দিয়ে যে-ভাবে রি-এ্যাক্ট্ করিয়েছেন দেওয়ালের কাছে, গরুর গাছে চড়ার মতন ; তাতে চমৎকার-ভাবে গাওয়া ভাল গানটি মাঠে মারা গেছে। টপ্পার গান শুনতে মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। যেমন

গায়ককে করতে হয় গাইতে। দর্শক ও শ্রোতার কষ্ট হয়, যখন বাগান থেকে গাওয়া সরলার টপ্পা ভেসে আসে কানে আর ঘরের মধ্যে মাধবীকে "ঠাকুর ঠাকুর" করে আর্তিতে মরতে দেখেন। এইখানে মাধবী চুপ করে বাগানের দিকে চেয়ে থাকলে গানটির এফেক্ট ছবির উপর অনেক গভীরতর হতো। মাধবী এমনিতে যথেষ্ট ভালো অভিনেত্রী। তাঁকে এই নীরবতার সুযোগ দিলে তিনি তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারতেন বলেই আমার মনে হয়।

রমেন চরিত্রটি সম্পূর্ণতা পায়নি কারণ তাকে মালঞ্চের বাইরে এত কম দেখা গেছে যে. মনে হয়েছে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ না থাকলে নারী চরিত্রগুলি মন খুলতে পারতো না কারো কাছে। একমাত্র সেই কারণেই রমেনের অস্তিত্ব। তার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ অতি সামান্যই দেখান হয়েছে। সেটা আর একটু বেশী দেখালে সেই বিশেষ যুগটি প্রতিভাত হত। দেশের ঐ সময়ে যে শুধু মালঞ্চ আর মালঞ্চ-অভ্যন্তরস্থ প্রেমই মানুষের জীবনের একমাত্র উপজীব্য বিষয় ছিল এমন মনে হতে পারে ছবিটি দেখে।

অন্য সব জায়গায় পূর্ণেন্দু জামা-কাপড় আসবাব সবকিছু সম্বন্ধে নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবে সময়ানুগ হয়েছেন। শুধু হননি মনে হয় হাসপাতালের দৃশ্যে। ঐ সময়ে অপারেশান-থিয়েটারে এত আধুনিক যন্ত্রপাতি কি ছিল?

এই সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে, পূর্ণেন্দু একটি অসাধারণ

ছবি উপহার দিয়েছেন আমাদের। পূর্ণেন্দু সাধারণ পরিচালক কখনই ছিলেন না। বহুমুখী তাঁর প্রতিভা। ছবি আঁকায়, কবিতাতে, গদ্যরচনায়, প্রবন্ধ রচনায় এবং সেলুলয়েডের ছবি রচনাতে ত বটেই! তাঁর বিশেষত্বর ছাপ ছবিটির আপাদ মস্তক জুড়ে রয়েছে। বহুদিন পর কোনো ভালো বাংলা ছবি দেখলাম। রঙিন ছবি ত বটেই। পূর্ণেন্দু ভবিষ্যতে আরোও ভালো ছবি করুন এই প্রার্থনা করি। অভিনয় প্রত্যেকেরই ভাল। মাঝে মাঝে নায়ক একটু আড়ষ্ট এবং অন্যমনস্ক। সে যুগের ধনীরা বোধহয় এ রকমই হতেন।

ইতি—

বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

আজ সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রসদনে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের লেখা ও সুরারোপিত গান শুনতে গেছিলাম। আমাদের বাবা মায়েদের যৌবনযুগের পরিচিত সব প্রিয় গান।

রবীন্দ্রসদনে সাবিত্রী ঘোষ এসেছিলেন। তিনিই প্রথম গাইলেন। গান এখন তেমন ভালো লাগলো না। দুবার জল মুছলেন চোখের। এত বছরের দূরত্বেও ভালোবাসা চোখের জল দাবী করতে পারে? বিশ্বাস হয় না, এই অবিশ্বাসের যুগে। হয়ত সে যুগের মানুষরা অনেক সৎ ও আন্তরিক ছিলেন। আমি যদি কাউকে সুরসাগরের চামেলীর মত ভালোবেসেও থাকি তাহলেও তার চোখে আমার মৃত্যুর সাতদিন পরেও হয়ত জল থাকবে না। সে যুগের চামেলীরা আজকাল ফোটে না, জমি খারাপ হয়ে গেছে, কুলষিত হয়ে গেছে। হয়ত সেই চাঁদও আর ওঠে না। পরিমণ্ডলে এত ধোঁয়া ধুলো বিষ যে, চাঁদের আলো আর তেমন করে চামেলীর কাছে পৌঁছয় না।

আমাদের বাঙালী প্রেম ওঁদের লায়লা-মজনুর প্রেমের মত খ্যাতি লাভ করেছে। হিমাংশু দত্ত নিশ্চয়ই আমার চেয়েও বেশী রোম্যান্টিক ছিলেন। এবং স্বভাবতঃই মূর্খ। সাবিত্রী ঘোষকে আজকে দেখার পর সত্যিই কষ্ট হল। সুরসাগর ত কবেই চলে

গেছেন। এই ধরনের অশরীরী রোম্যান্টিক ভালোবাসা একমাত্র ভারতীয়রাই সে যুগে বাসতে পারতেন। আজকে বোধ হয় ঠিক ঐ রকম ভালোবাসা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো দেশেই।

তবে সেই যুগে তিনি যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। গানের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রেমিকাকে পরিচিত জগতে একটা চিরস্থায়ী আসন করে দেওয়ায় এবং সেই প্রেমের ভূমিকাকে চাঁদ ও চামেলীর মাধ্যমে নিজেদের দুজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ার মূল্য কি এবং কতটুকু তা প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্রই জানেন। সুরসাগরের প্রেম, গান এবং সমস্ত আত্মবঞ্চনা বিফল হয়নি। কারণ এখনও চামেলীর চোখ দিয়ে তীব্র আলো-জ্বালা মঞ্চে বসে-থাকা অবস্থাতেও চাঁদের জন্যে জল পড়ে। সেই চাঁদের জন্যে, যে-চাঁদ চিরদিনই মেঘের পারেই ছিল ; পৃথিবীর চামেলীর কাছে যার কখনোই নেমে আসা হয় নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীর গণ্ডার এবং সিংহের মত এমন প্রেমিক-প্রেমিকাও আজ বড়ই বিরল হয়ে উঠেছেন।

প্রেম ব্যাপারটা দেহাতীত, সময়াতীত ; বয়সাতীত এবং কালাতীতও। তবুও অশরীরী প্রেমে একসময়ে বিশ্বাস করলেও আজ আর করি না। অমন প্রেমের একটা বয়স থাকে শরীর এবং মনের। তারপর নিজের মানসিকতার পটভূমি বিস্তৃততর হতে থাকলে, অভিজ্ঞতার মেঘে পরশ লাগতে থাকলে ; তখন অন্য রকম মনে হয়। যাকে ভালোবাসি,

তার শরীরে যেতে, শরীরকে পেতে ; বড়ই ইচ্ছা করে। এবং পাওয়ার পরমুহূর্তেই তার শরীরের উষ্ণ-কোরকে নিজের শরীরের প্রাণ নিংড়ে দেওয়ার মুহূর্তেই চমকের সঙ্গে আবিষ্কার করতে হয় যে, শরীরটা কিছুই নয়। শরীরে কিছুই নেই, মনটাই সব। আবার তবুও কিছুদিন পরই প্রেমিকার শরীরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগে। আমাকে যে তার অদেয় কিছুই নেই, তাকে শরীরের সমস্ত অনুপরমাণু দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে এবং তার শরীরকে ভরে দিয়ে নিজেকে, নিজের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশ্লাঘাকে বার বার পুনরুজ্জীবিত করতে ইচ্ছে যায়।

আসলে শরীর আর মন এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা যায় না। মনের ভালোবাসার বৈচিত্র্য, গভীরতা ও আনন্দ অনেক বেশী তীব্র ; কিন্তু শরীরও ভালোবাসা চায়। তাকে উপবাসে রাখলে মনের ভালোবাসার স্ফূরণ হয় না। শরীর না-পাওয়ার আগে যে তীব্র ভালোবাসা ; যাকে কামগন্ধহীন প্রেম বলে জানি আমরা, আমার মতে ; তার মতো তীব্র-কামগন্ধী প্রেম আর হয় না। সত্যিকারের প্রেমের উন্মেষ ঘটে শরীরের খিদে পুরোপুরি মিটিয়ে নেবার পরই।

সুরসাগরের গানের মধ্যে আরতি দত্তর (আগেকার মাঞ্জা দাস ?) গান বড় ভাল লাগল। কত বয়স হয়েছে, কিন্তু কী চমৎকার গলা। তখনকার দিনের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ফাঁকি ছিলো না। প্রত্যেকেরই রাগপ্রধান গানের ভিত

ছিল, যে-কারণে গলায় তান-বিস্তার অতি সহজে আসত।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় উমা বোস-এর গাওয়া দুটি গান গাইলেন। কিন্তু উমা বোসের গলা ভগবানদত্ত ছিল। কৃষ্ণা খুব ভালোই গেয়েছেন কিন্তু মনে হলো প্রাণপণে উমা বোসের কাছাকাছি আসতে চাইছেন। অনুকরণে কেউ কী কখনও কোনো আদিকে ছাপিয়ে যেতে পারেন? উমা বোস হবার মত চেষ্টা না করে, নকল না করে নিজের গায়কীতে গাইলেই ভাল করতেন উনি। ও'র গলা ত বেশ ভালোই। কিন্তু এমন এমন কিছু গায়ক-গায়িকা থাকেন তাঁদের গলা অনুকরণ করা যায় না। তাঁরা তাঁরাই। তাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত।

এই সব গলা ভগবানের দান। চেষ্টা করে, কসরৎ করে একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছনো যায় জীবনের সব ক্ষেত্রেই; কিন্তু শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে সাধারণের একটা সীমারেখা থাকে। যাঁরা সেই সীমার ওপারে পৌঁছোন, তাঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদসংপৃক্ত। তাঁদের অনুকরণ করতে গেলে অনুকরণ-কারীর সামান্যতাই বড় নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে অখিল বন্ধু ঘোষের গান ভাল লাগলো। সুরসাগরের গান। কিন্তু প্রত্যেকটি গান শচিনকর্তার গাওয়া। তাঁর প্রথম দিকের গান। অখিলবাবুর কিন্তু দাঁত-বাঁধিয়ে নেওয়া উচিত অবিলম্বে। নইলে, এত ভাল গান সব ফস্ ফস্ করে হাওয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, লাল প্লাস্টিকের গ্লাসে কি যেন খাচ্ছিলেন। ওঁর হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হল

মদ। অনেক শিল্পীর এমন হয়ে থাকে, মদ না খেলে গাইবার সময় আত্মবিশ্বাস থাকে না। এও এক ধরনের ব্যাধি? এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির প্রমাণ। মদই কি খাচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে মদ আমিও খাই। গান গাইবার সময় খেলে, গান গাইতে ভালোও লাগে এবং মনে হয় গলা খুলে যায়। আরও গান গাইতে ইচ্ছে করে। ফলে একটা বিপজ্জনক সময় আসে যখন শ্রোতারা শুনতে না-চাইলেও আমার মত অ-গায়কের উৎসাহ তাঁদের প্রায় ধরে-বেঁধে গান শোনাতে বাধ্য করে। যাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁরাই জানেন।

বাইরের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের আর একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। তাতে শিল্প এবং শিল্পী দুইয়েরই সম্মান বাড়ে। একথা শিল্পীদের চেয়ে বেশী প্রযোজ্য এযুগের বিজ্ঞাপনের ডংকানিনাদিত, উচ্চমণ্য; কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিও।

গানের একটা মস্ত সুবিধে এইই যে, গায়কের বিচার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সাহিত্য-কাব্যের বিচার হয় ধীরে ধীরে। অতি ধীরে ধীরে, পাঠক-পাঠিকার মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই রস নিঃশব্দে চুঁইয়ে যায়। তাই সাহিত্যিককে সাহিত্যিক হয়েছেন কি হননি, তা জানতেই অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাঁর সাহিত্য-কর্ম প্রকাশিত হবার পরও। যে গায়ক মঞ্চে বসে বা রেকর্ডে খারাপ গান করেন তাঁকে শ্রোতারা বাতিল করেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কবি-সাহিত্যিককে

বাতিল করেন পাঠকেরা অনেক পরে। গায়কের মৃত্যু, সরল তাৎক্ষণিক, কিন্তু সাহিত্যিকের মৃত্যু বড় বিলম্বিত, তাইই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

ইতি—তোমার
বুদ্ধদেবদা

রোণ্ডিয়া

পানাগড়

মহুয়া,

স্যার জন এণ্ডারসন ১৯৩৩ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর রোণ্ডিয়া ব্যারাজ ওপেন করেন। দামোদরের উপর। অনেক মেহগনি গাছ পুঁতে গেছিলেন সাহেবরা তখনই। রোণ্ডিয়া বাংলোটাও তখনই হয়।

বাংলোর হাতায় নানারকম গাছ আছে। নতুন নতুন অনেক ফুলের গাছও লাগিয়েছেন নতুন একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়র, শ্রী আর, এন, দে। কাঠ-কাঞ্চন, কাঞ্চন, টগর, কামিনী; নানাফুল। গেটের ডান পাশে দুটো মেহগিনি দেখলাম। মেহগিনির পাতাগুলোতেও যেন সোনার ঝিলিক। শিরিষও আছে। নিম, দেবদারু, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, চাঁপা, আম, কাঁঠাল, করবী, সোনাঝুরি, গন্ধরাজ, যুঁই, বেল, বোগেনভিলিয়া, কেয়া, জবা, সজনে। ব্যারাজের ডানদিকে দামোদরের বুকে একটি হ্রদের মত সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার মেঘমেদুর বিকেলে বাঁদিকের সোনালী বালির বিস্তীর্ণ চরকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। চরের পাশে পাশে মাঝে মাঝে কাশ ও শরের চিকন-সবুজ শরীর, পড়ন্ত বিকেলের বিধুর আলোর মত সোনালী বালির চরের পটভূমিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

জেলেরা ব্যারাজের বাঁ দিকে যেদিকে জল পড়ছে, সেখানে বাঁধ-জাল পেতে চিতল, কালোবাউস আর বাটা ধরছে।

দ্বিজপদ আঁকুড়া চৌকিদার। জেলেদের মধ্যে নানান জাত আছে। রাজবংশী, আঁকুড়া ও জেলে। এখন আর পেশাভেদে জাত ভেদ নেই। পেটের জন্যে যে যা করে। বাঁধের বাঁপাশে ফতেপুরে কসবা গ্রাম। নদীর পারে আছে মানা গ্রাম। মানা ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তুরা বহুদিন আগে এসে এখানে বাসা বেঁধেছিল। সন্ধ্যের আগে আগে মেয়েরা মাথায় হাঁড়ি-কলসী নিয়ে বাটা মাছ কিনে চরের উপর দিয়ে কাশিয়া আর শরের মধ্যে মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে মানার দিকে। এ মানা, অন্য মানা।

রোগুিয়ার আগের গ্রাম চাকতেঁতুলের বাউড়িপাড়াতে ছ বছর আগে একরকম পোকার উপদ্রব হয়েছিল মশার মত। সেই পোকার কামড়ে লোক মারা যায়। ওরা জাতে বাউড়ি—। চাকতেঁতুল গ্রাম এখনও ঠিকই আছে। শুধু বাউড়ি পাড়া থেকে ওরা এসে এখন ব্যারেজের নালার পাশে খড়ের অথবা কাঠের ঘর করে রয়েছে। ওরা নাকি গ্রামের মনসা ও কালীমাকে অসম্মান করেছিল। শেষ বিকেলে উদলা-গায়ে চান সেরে, বিকেলের আলোতে টানটান ভিজে স্তনে মসৃণতা ছড়াচ্ছে লাল শাড়ি পরা বাউড়ি মেয়ে। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাচ্ছে ভাবরির (ছোট ছোট জংলা ঝোপ) উপর দিয়ে সবুজ জমির আস্তরণ পেরিয়ে। একটা কালো

ঘাড়ে-গর্দানে রোমশ কুকুর একটি দুর্বল বাদামী কুকুরীকে কামোন্মোত্ত হয়ে তাড়া করেছে। কুকুরীটা লেজ দিয়ে স্ত্রী অঙ্গ ঢেকে একেবারে জলের কোণায় চলে গিয়ে জলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু মরদের হুঁস নেই। কামের পোকার কামড় ঢাকতে তুলের পোকার কামড়ের চেয়েও অনেক বেদনাদায়ক।

বক উড়েছে বাঁধ-জালের উপরে উপরে—বাঁধ থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে মস্তিষ্কের মধ্যে দূরের স্মৃতির সোনাঝুরি শব্দের মত। দামোদরের পাড়ে গ্রামে গ্রামে সন্ধ্যে হওয়ার শব্দ উঠছে আলতো হয়ে, পশ্চিমের সন্ধ্যে-তারার সবুজ দ্যুতির সঙ্গে।

কসবা-মানার পাশে চম্পাইনগরে মাঘ মাসে মেলা বসে—বেহুলা-লখীন্দরের স্মৃতিতে। তার পাশে সাঁতালী পর্বতে (ন্যাড়া উঁচু ঢিপি) লখীন্দরের বাসর-ঘর ছিল। মেলাতে চুড়ি, পিতলের থালাবাসন, ছাতা, জুতো, কাঠের জিনিস, দরজা-জানালা, পাথরের বাসন এই সব ওঠে। শাড়ি, ধুতি, গামছা, ম্যাজিক পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা।

চাকতেঁতুলে চৈত্র মাসে গাজনের মেলা বসে। বিশ তিরিশ ফিট উপর থেকে বঁটির উপরে ঝাঁপ দেয়। গাজনের সন্নিসীরা।

রোণ্ডিয়াতে ও কসবাতে; কেউ কেউ কাহেবাও বলে, এবং চাকতেঁতুলেও শিবমন্দির আছে।

হাটটা আগে রোণ্ডিয়াতেই বসত। হাটের মাশুল নিয়ে

মন-কষাকষি হওয়াতে হাট এখন রোণ্ডিয়া থেকে ফোতোপুরের পথে যেতে যে মোড় আছে—যেখানে আটাকল, তার পাশে বসে। একটা পুকুর। তাতে সব্‌জে-নীল জল। পুকুর পাড়ে নিমগাছের সারি। পাড়ের দুপাশে নিমগাছ। নিমফল এসেছে আষাঢ়ের শেষে। আঁশফল, তাল, বাবলা বেল এবং কৃষ্ণচূড়াও আছে। তরি-তরকারি, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, প্লাসস্টিকের জুতো-চটি, চুড়ি, নানারকম কাঁচের গয়না, টিপ, ইঁদুর-মারা ওষুধ, মাছ-ধরার পোলো, পাকৌড়ি-ফুলুরীর দোকান, মাছ, মুরগী, হাঁস, চাল, নিরোধ সব সুন্দর পাশাপাশি।

রোদে-পোড়া চিকন কালো টানটান চেহারার মানুষ-জন। আঁটো-করে পরা গোড়ালির অনেক উঁচুতে-তোলা শাড়িতে কিশোরী। ব্লাউজের ফাঁকে ফলসা-রঙা আঁট-সাঁট স্তন, তার ঘামের গন্ধ, কামের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, জলের গন্ধ, চিটেগুড়ের গন্ধ সব মিলে মিশে গেছে।

পরেশনাথ গুপ্তর দেশ উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে। এখানে এসে সে দামোদরের পাড়ে খড়ের ঘর বানিয়ে চা-এর দোকান দিয়েছে। সঙ্গে মাছের কারবারও করে। বাটা, চিতল, কালবাউশ, চিংড়ি, ট্যাংরা, সোনা-ট্যাংরা, আড়; কত মাছ। আর কদিন বাদে ইলিশও উঠবে। কী যে স্বাদ এই ইলিশের। বেশী উঠলে টাকায় দু-তিনটেও পাওয়া যায়।

পরেশের কালো ভুটিয়া কুকুরী লক্ষ্মী, শুয়ে শুয়ে দোকানের সামনে দামোদরের হাওয়ায় ঘুমোয়। আজ একটা জুই-

আড় উঠেছে। শ'য়ে একটা ওঠে। মুখ-ছোটো আড়।

বাঁধের উপর কালো পাথরের ডাঁই। এদিকে ওদিকে ফণিমনসার ঝোপ, অশ্বত্থ, সেগুনের চারা গজিয়ে উঠেছে। সেখানে বড় বড় সাপ থাকে—গোখ্‌রো, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়। মাছ খায়। কখনো কামড়ায় না কাউকে। লখীন্দরকে কামড়েছিল শুধু।

নীলমণি আগে পানাগড়ের মিলিটারী ক্যাম্পে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। বুক-খোলা নীল হাফশার্ট আর লুঙ্গি পরনে। মাছের ব্যবসা করে। আসলে সেটা একটা ছুতো। রোজগার কমই হয় তাতে। কিন্তু ও স্বভাবে কবি। দামোদরের পাশে হু-হু হাওয়ায় বসে লাল ঘোলা জল আর চাপ চাপ নরম স্বপ্নিল সবুজ ঢালে, দূরের খড়ে-ছাওয়া ঘরের দিকে চেয়ে নীল শাড়ি পরে ঘুড়ে বেড়ানো গোবর-লেপা উঠোনে সজনে গাছের তলায় তার প্রেমিকা সোনামণি ঘুরে ঘুরে মুরগীর জন্যে ধান ছিটোয়। ও দেখে; ভাল লাগে। যাত্রার গান বাঁধে মনে মনে। দুটি বইও লিখে ফেলেছে নীলমণি—পালার বই। সি-পি-এম করে ও। পালাতে, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছে ও। ক্লাস-নাইন অবধি পড়েছিল।

হাটে আলাপ হল সোবেদ মণ্ডলের সঙ্গে। পোলো বিক্রী করছিল। কী সুন্দর হাতের কাজ! বাঁশ আর সুতো দিয়ে কী সুন্দর করে বানিয়েছে! বাঁশী বাজায় ও

অবসর সময়ে। ওর বাজনার দল আছে। বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, ড্রাম। মাঝে মাঝে লোকাল ট্রেনে চেপে কোলকাতায় জানবাজারে গিয়ে যন্ত্র কিনে নিয়ে আসে। বিয়ে-চুড়োতে বায়না পায় মাঝে-মাঝে বাজনা বাজাবার। আনন্দ ছাড়াও দুটো পয়সা ঘরে আসে।

এখানের পঞ্চায়েত ইলেকশানে প্রায় সবই সি-পি-এম জিতেছে। নির্দল জনা-চার। ইন্দিরা কংগ্রেস এক। বি-ডি-ওর জীপ আসে গুটুর-গুটুর আওয়াজ তুলে। মেহগিনি গাছের ছায়ায় ছায়ায় লাল মোরামের রাস্তা বেয়ে বাঁধের উপরের পথ বেয়ে বর্ধমানের দিকে চলে যায়।

রোণ্ডিয়ার বাগানে বুলবুলি, টুনটুনি মৌ-টুশ্‌কী, পাপিয়া ভীড় করে। গভীর রাতে নদীর পারে পারে টীটী পাখি ডেকে ফেরে। চাতক পাখিরা দল বেঁধে ফটিক-জল ফটিক-জল বলে উড়তে থাকে চাঁপাগাছের মাথায় সন্ধ্যের আগে আগে। বাঁধের পাশের সবুজ চালের গায়ে ভাবরির জঙ্গলে নীল কাঁচপোকা ওড়ে। ছাগল চরে, পরম আত্মতৃপ্ত মুখ নিয়ে। মৌমাছি ওড়ে, গুনগুন করে। নদী থেকে-আসা হাওয়াটা হঠাৎ থেমে যায়। মেঘ করেছে। গুমোট। জল হবে একটু পরে।

ইরিগেশান ডির্পাটের এ্যাসিসট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার দত্ত সাহেব বলেন আমি এখান থেকে কেটে পড়বোই। দেখবেন এমন বাজে জায়গায় কেউ থাকে? তাছাড়া, লোকগুলো মহা

ঝামেলার। ঐ ত খুন হল সেদিন বাঁধের উপর। সন্ধ্যে রাতে।

এই রোঙীয়া উয়্যার এবং এই পরেশ গুপ্ত, নীলমণি এদের নিয়ে একটি গল্প লিখব। কখনও। নীলমণিকে নায়ক করে। গল্পে ওর নাম দেব সনাতন আঁকুড়া। আর গল্পের নাম: "লতুল পালা"। যে-পালা লিখছে নীলমণি।

চরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। বৃষ্টিভেজা ঘুঘুর বিষণ্ণ ডাক যেন বুকের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেয়। নিজের বুকের মধ্যে বেদনাতুর হৃদয়কে স্থানে স্থানে কে যেন তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্র দিয়ে অমোঘ নিরুত্তাপ হাতে ধীরে-সুস্থে, ঠাণ্ডা-মাথায় জবাই করে।

লাল-ভেরাণ্ডার (ভেরেণ্ডা) গাছগুলো ভারী সুন্দর। পাতাবাহারের মত লাল-কাল চিকন উজ্জ্বল পাতা। টুনটুনি পাখী ডাল-দুলিয়ে উড়ে যায় কাশিয়ার ঝোপে ভরা চরের দিকে। পাখির নীচু হয়ে উড়ে যাওয়ার গতির সঙ্গে গতিষ্মান হয় আমার চোখ। যেখানে নদী মিশেছে দিগন্তে, বালির চর কাশিয়া আর শর বন মিশেছে নদীতে, আর আকাশ মিশেছে মেঘে। মন সেখানে পৌঁছে, চোখের দিগন্তকে বিদ্ধ এবং অতিক্রম করে কল্প-নার এবং স্মৃতির পশ্চিমাকাশে ধ্রুব তারা হয়ে ফুটে উঠতে চায়।

এ জীবনে চাওয়ার দুঃখ, না-পাওয়ার দুঃখ এবং পাওয়ার দুঃখও এই বর্ষাবিধুর নদীর চরের হু-হু হাওয়ায় আমার সমস্ত ভিজে মনকে উথাল-পাথাল করে।

ইতি—

তোমার বুদ্ধদেবদা

শিলিগুড়ি

মহুয়া,

সেই জানুয়ারী মাসে শান্তি আর জেস্‌মিনকে নিয়ে পালামৌর মারুমারে গেছিলাম। তারপর আর বেরুনোই হয় নি। যে-ভাবে দিনে রাতে আঠারোঘণ্টা কাজ নিয়ে মাস কাটে আমার,—তাতে মাঝে-মাঝেই কোলকাতার বাইরে চলে না যেতে পারলে, বাঁচাই মুশকিল।

কোলকাতার বাইরে যাওয়ার কথা উঠলেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কথা মনে পড়ে। "একটু উষ্ণতার জন্যে" উপন্যাসে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ধরা থাকবে চিরদিনের মত। আমার ধারণা যে, "কোয়েলের কাছের" মতই এই উপন্যাসও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং যতদিন যাবে, ততই কদর বাড়বে এর।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যা হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে, তা অন্য হৃদয়ের তত গভীরে গিয়ে পৌঁছয়। আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। সাহিত্যে ভঙ্গি, মেকী-ইণ্টেলেক্ট এর বানানো বান, চমক ইত্যাদির চেয়ে শ্লথগতি অথচ-সুখপাঠ্য আপাত-সাধারণ অথচ অত্যন্ত গভীর অনুভূতির অভিব্যক্তি চিরদিনই বেঁচে থাকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে। যুগে-যুগে পাঠক বদলায়, তার মানসিকতা বদলায়, পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয়, জীবনযাত্রার ধরন এবং অনেকানেক বোধও

বদলায়; তবুও মনে হয় মানুষের মনুষ্যত্বব্যঞ্জক বহুবিধ বোধ ও অনুভূতি চিরদিন একই থাকে। যেখানে মানুষ এক, শাশত এবং গোঁড়া। গোঁড়া কথাটা আপেক্ষিক। গোঁড়া শব্দটির সঙ্গে মূলের কোন গভীর আত্মিক সাযুজ্য আছে। মানুষের মনের এক বিশেষ এলাকায় গুহামানব আর চাঁদে-পা-দেওয়া মানুষে তফাত বিশেষ দেখি না। বিবর্তনের ঢেউ সেই গভীরে-প্রোথিত মূল-অনুভূতির শিকড়কে ধুয়ে নিতে পারেনি এতদিনেও। ভবিষ্যতেও যে পারবে, তা মনে হয় না।

যাই হোক, ম্যাকলাস্কির কথা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে এলাম। ম্যাকলাস্কির "দ্যা টপিং হাউস" বিক্রী করে দেওয়ার আগে ঐ জঙ্গলের গভীরের পর্ণকুটিরটিকে যে কতখানি ভালবাসি তা একটুও বুঝতে পারিনি। রিণা কিনতে চাইল। ঋতু সমেত সকলকেই বলেছি যে, রিণার সুন্দর মুখের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। কোনো সুন্দর মুখই জীবনে আমার কাছে কিছুমাত্র চেয়ে কখনও না উত্তর পায়নি। রিণাকেও না করতে পারিনি। তখন টাকার প্রয়োজনও ছিল। যাকে বলে, 'গট্ ইট ফর আ সঙ্' তাইই পেলও। যদিও, গান না গেয়েই।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আইডাহোর বাড়ির নাম ছিলো "দ্যা টপিং হাউস।" জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে। হেমিংওয়ের বাড়ির নামে নাম রেখেছিলাম আমার কটেজের। হেমিংওয়ে ঐ নামের বাড়িতেই আত্মহত্যা করেছিলেন। শোওয়ার সময়

মাথার বালিসের নীচে লোডেড পিস্তল রাখার দরুন এক রাতের দুর্ঘটনায় আমিও এক রাতে মরতে বসেছিলাম।

বড বড় নিমগাছ গুলো, ঝুপড়ি আমগাছ, শাল আর পলাশের জঙ্গল—যে-জঙ্গলের একটিও গাছ কাটতে বারণ করেছিলাম আমি। ছোটকাকু একবার বেড়াতে গিয়ে জঙ্গল হয়ে গেছে দেখে কিছু গাছ কেটেছিলেন বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঁকে বলেছিলাম, জঙ্গল করেই রাখতে চাই এই জঙ্গলের বাড়ি। কারিপাতা গাছ, ফলসা গাছ, চেরী গাছ, প্লাম গাছ, পীচগাছ কত ফুল, কত পাখি আর কী নিবিড় গভীর প্রশান্তি। আমার লেখার ঘরটি—লেখার ঘরের জানালা দিয়ে চোখমেলা আদিগন্ত সবুজ—ঘনসবুজ পাহাড়। বর্ষার দিনে পাহাড় চুড়ো থেকে গড়িয়ে-আসা এক্সপ্রেস ট্রেনের মত শব্দ ওড়ানো বৃষ্টি। বৃষ্টির গন্ধ, বৃষ্টির পরে বন-পাহাড়ের গায়ের গন্ধ ; কোনো ভালোবাসারজনের চান-করে ওঠার অব্যবহিত পরের গায়ের গন্ধের মতন।

বসন্তের দিনের মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ, ওঁরাওদের মাদল-বাজানো গান, পিউ-কাঁহা আর কোকিলের সারারাত-ব্যাপী চাঁদের আলোয় মোহময় বনের বুক থেকে চমকে চমকে ডেকে ওঠা। শীতের রাতে, টালির ছাদে বাড়ির আশে পাশে শিশির পড়ার ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ। ফেব্রুয়ারীতে শিয়ালদের নালার গভীরে চিৎকৃত মিলনের রব। গ্রীষ্মের ভোরে হাজার পাখির ডাকে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম-ভাঙা। বুলবুলি

টুনটুনি, কত রকম মৌ-টুসকী, টিয়ার ঝাঁক, ক্রো-ফেজেণ্ট, ব্যধ্‌লার, থ্রাশার, মিনিভেট, ওরিওল্; কত রকমের রঙ-বেরঙের ফ্লাই-ক্যাচার। পাখির জগৎ।

ও বাড়িতে আর যেতে পারব না। রিণা বলেছিল, বছরে ছ বার আমি যখন খুশী যেতে পারি, যতদিন খুশী থাকতে পারি। কিন্তু মানি, মুঞ্জরী আর ও বাড়ির সঙ্গে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।

যা আমার পুরোপুরি নয়, তা সম্পত্তিই হোক কী মানুষই হোক তার উপর কোনো অধিকার বর্তাতে পারিনি আমি কোনোদিনই। যাকে আমি পুরোপুরিই আমার বলেই জানি, যে আমার যে-কোনো দাবী, যে-কোনও আবদার, যে-কোনো অত্যাচারই মানতে রাজী; সেইই আমার। এ বাড়ি, জীবনের হারিয়ে-যাওয়া একাধিক নারীরই মত আর আমার নেই।

বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে বড় মুচড়ে-মুচড়ে ওঠে। বিরহই মানুষকে বুঝতে শেখায় মিলনের গভীর আনন্দ। প্রিয়জনের সঙ্গে আশ্লেষে, ঘোরে; যখন অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকা যায়, তখন মিলন খরস্রোতা নদীর মতই বয়ে যায়। সেই নদীর আবর্তের মধ্যে থাকাকালীন নদীর চেহারাটা একেবারেই প্রতীয়মান হয় না। জলের স্রোতের গতি, পায়ের নীচের বালি, গায়ের পিছলে-যাওয়া রোদ এই সবে মিলন মাখামাখি হয়ে থাকে। সেই মিলনের নদীর সৌন্দর্য তখনই পরিস্ফুট হয়, যখন দূরের

বিরহের পাহাড়-চুড়ো থেকে সেই মিলনের নদীকে দেখতে পাওয়া যায়।

আমার মনে হয় প্রাপ্তির মধ্যে, সম্পত্তির মধ্যে, মিলনের মধ্যে সত্যিকারের সুখ নেই। প্রাথমিক সুখ প্রাপ্তির আশায়, কামনায়; মিলনের কল্পনায়। আর শেষ এবং সার্বিক সুখ একসময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং মিলনের স্মৃতিতেই। মিলনকালে ভালোবাসার যে গভীরতা থাকে বিরহে তার ব্যাপ্তি ঘটে। দূরে না-গেলে, দূর থেকে না-দেখলে; কিছুই যথার্থ মূল্য পায় না।

মাঝে মাঝে নিজেকেও নিজের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে দূরে চলে যেতে হয়। তখন সমস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, পাওয়া-না-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-মিলন সবকিছুই ভাস্বর হয়ে স্বচ্ছ ও দেবদুর্লভ প্রকৃত-সত্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাই, যা হারিয়ে যায় তাইই পরম ধন হয়ে থাকে। আর যা আমারই মালিকানায় থাকে তার দাম বুঝিনা। কাছে থাকে বলেই বুঝি, সে চোখ জুড়ে থাকে। তাকে ভালো করে দেখতে পর্যন্ত পাইনা। দূরে গেলেই তার সৌন্দর্য, তার নরম হৃদয়ের দ্যুতি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এবারে কমিশনারদের সঙ্গি হিসেবে জলপাইগুড়ি গেলাম। উঠলাম ভাণ্ডাগুড়ি চা-বাগানের অতিথিশালায়। শিকারপুরের পাশে। এই শিকারপুর জলপাইগুডির রাইকত রানী প্রতিভাদেবীর। যখন তিনি আমাদের মক্কেল ছিলেন তখন এই বাগানে একাধিকবার এসেছি। সরস্বতীপুর বাগানেও

গেছিলাম ওঁরই সঙ্গে। শিকারপুরের কাছেই ভাণ্ডাপুর বাগান ছিল। সন্ন্যাসীকাটা-হাট। আনন্দমঠের। সরস্বতী-পুরের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিস্তার যে রূপ দেখেছিলাম তা ভোলার নয়। উল্টোদিকে আপাল চাঁদের জঙ্গল—কাঠামবাড়ির ফরেস্ট বাংলো। আরো ওপাশে চ্যাংমারীর চর।

জলপাইগুড়ির রানী প্রতিভাদেবীর স্বামী ছিলেন ডঃ কিরণ বোস। জ্যোতি বসুর আপন দাদা। ডঃ বোস গত হয়েছেন।

সকালে উঠে জলপাইগুড়ি গেলাম ব্রেকফাস্ট করে। জলপাইগুড়ি ক্লাবে অফিসারেরা কমিশানারদের লাঞ্চ খাওয়ালেন। লাঞ্চ টাঞ্চ খেয়ে আমরা গরুমারা স্যাংচুয়ারীর দিকে রওনা হলাম। শ্রী ও শ্রীমতী টি-ওয়াই-সি রাও এবং শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সেনের সঙ্গে। শরদিন্দু ভট্টাচায্যি মশায়ও ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

মাল হয়ে বিকেল বিকেল গিয়ে পৌঁছলাম। পাশেই একটি চা বাগান। পুলিশ ফাঁড়ি দিয়ে স্যাংচুয়ারীতে ঢুকতে হয়। যে-জায়গায় গরুমারা বাংলোটি, সেটি সমতলে। বাংলোর হাতার সীমানায় একটি কাঠের বারান্দা মত—বাইরে বের করা। নীচে সোজা নেমে গেছে খাড়া পাড় প্রায় পাঁচশ ফিট। খাড়া পাড়ের পা ধুয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী, তার নাম ইনডং। দূরে পাথর ছড়ানো একটি সুন্দর নদী চোখে পড়ে, এঁকে বেঁকে চলে গেছে। তার নাম মূর্তী। জানোয়ার দেখে মানুষ, সেই বারান্দায় বসে। বারান্দার

সোজা সামনে গাছ কেটে গ্রেড মতো করা হয়েছে। প্রায় আধমাইল অবধি তিনদিকে চোখ যায়। নীচেই সল্ট-লিক্ তৈরী করা হয়েছে। মেকী। দু'পাশে দুটি প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। একটি শুকনো সাদা ডালের শিমুল। তার চূড়োয় বসে সোনালী বাজ ডানা ঝাড়ছে। লেজ ঝুলিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে বসে আছে প্রকাণ্ড ময়ূর।

দুটি শূয়োর এলো।

চারদিক থেকে ময়ূব ডাকছে আর হনুমান।

সন্ধের পর চাঁদ উঠলো না। অন্ধকার রাতে তারারা একে একে আকাশময় ফুটে উঠল। বাংলোর নীচে ঘাসের উপর চেয়ার পেতে বসে আমরা গল্প করছিলাম। দূরের হিমালয়ের বুকে আলেয়ার মত আলো জ্বলে উঠছিল মাঝে মাঝে, পরক্ষণেই নিভে যাচ্ছিল।

ভট্টাচায্যি সাহেব বললেন, এ আলোগুলো চালসার পথের গাড়ির হেডলাইট। আশ্চর্য লাগে দেখলে। মনে হয় আকাশপথে কোনো অশরীরী আত্মা আলোকবর্তিকা নিয়ে যাওয়া আসা করছে।

শিলিগুড়ি ফিরে বিকাশ পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে মকাইবাড়ি, কার্শীয়াং এ নিয়ে গেল। পাঙ্খাবাড়ির পথের মত খাড়া পথ এ অঞ্চলে কমই আছে। যতটুকু পথ সমতলে, সেখানে হাতির বড়ই উপদ্রব। মকাইবাড়ি বাগানের মালিক পশুপতি ব্যানার্জী এবং মালিকপুত্র রাজার সঙ্গে আলাপ হল।

এ্যাল্‌সেশিয়ন ও হরেক রকম কুকুরে বাড়ি ভর্তি। মকাইবাড়ির চা খাওয়া হল।

কার্শীয়াংএ মাসীমার বাড়িতেও গেলাম ডাউহিলে। বড়ই মন খারাপ হয়ে গেল বাড়ি দেখে। ওঁর চাতুরীতেও মন কম খারাপ হলো না। চাতুরী আমাকে বড় ব্যথিত করে। আমার সঙ্গে যাঁরা চাতুরী করেন; তাঁরা প্রায়ই হারেন। একজন বড় বিচারক প্রায়ই চতুরদের হারিয়ে দেন অদৃশ্য আদালতের অমোঘ রায়ে।

মহানদী ফরেস্ট বাংলোতে রিজার্ভেশান ছিলো। পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে গেলামও। কিন্তু সেখানে না আছে খাওয়ার জল, না আছে চানের জল। তাছাড়া এক-দাঁতী গণেশ মহারাজ নাকি বাংলোর মধ্যে ঢুকে প্রায় রোজই অত্যাচার করছেন। সেভক রোডের উল্টোদিকের বস্তিতে লোক মেরেছেন, ঘর ভেঙেছেন। এ বাংলোতেও গরুমারারই মত জানোয়ার দেখার বন্দোবস্ত। নীচে আর্টিফিসিয়াল সল্ট লিক্। তিস্তা এদিকে অনেকটা সরে এসেছে। অনেক জঙ্গল ধুয়ে নিয়ে গেছে। জলস্রোত বইছে কাছেই। এ দিকের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিস্তায় শিলিগুড়ি শহরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোনোদিন। বড় সর্বনাশা নদ এ। পুরুষ হাতির "মস্তীর" সময় সঙ্গিনী না পেলে সে যেমন অসীম কামমত্ত ও সর্বনেশে হয়ে ওঠে প্রতি বর্ষায়, তিস্তারও সেই অবস্থা। এই দুর্দান্ত নদকে শীগগিরই কোনো শান্ত স্নিগ্ধ নদীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া দরকার।

কালকে গয়াবাড়ি-ফুকুরি-সোনাইরী হয়ে মিরিক গেছিলাম। মিরিক কমলালেবুর জন্যে বিখ্যাত। একটা আর্টিফিসিয়াল লেকও খুঁড়েছে এখানে। পাশে ট্যুওরিস্ট বাংলোও হচ্ছে নতুন। সৌন্দর্যর বাবদে খোদার উপর খোদকারী আমার দু-চোখের বিষ। সারা ভারতের ফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্টে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও সৌন্দর্যজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বোধ হয় খুব কমই আছেন। নইলে, স্বাধীনতার পর পর বিভিন্ন রাজ্যের জঙ্গলে যেখানে যেখানেই এই সব ব্যক্তিদের হাত পড়েছে, সেখানে সেখানেই প্রকৃতির স্বাভাবিক ও অনাবিল সৌন্দর্যকে কদর্য করা হয়েছে। কবে যে এঁদের সুবুদ্ধি এবং সুরুচি হবে জানি না।

গরুমারা স্যাংচুয়ারীর বাংলোতে কুক নেই। মহানদীতেও নেই। আসাম-বিহার-উড়িষ্যার বাংলোর চৌকিদাররা কত যত্ন করেই না রান্না-টান্না করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মত এমন ঢিলে, যত্নহীন ; দায়িত্বজ্ঞানহীন বনবিভাগ খুব কম আছে। যদিও দুর্নীতিতে উড়িষ্যা এবং বিহার এগিয়ে। কোলকাতার এত কাছে এমন এমন ভাল সমস্ত জায়গার বাংলোগুলো সম্বন্ধে বনবিভাগের বৈমাত্রেয় মনোভাব দেখলে চোখে জল আসে। সরকার এবং সরকারী আমলারা জনসাধারণের সেবক নন এই গণতন্ত্রে। তাঁরাই হলেন জনসাধারণের মালিক, তাদের ভয়-দেখানো জুজু। আদর না দিয়েই এঁরা শাসন করতে চান।

মিরিকের রাস্তার তুলনা হয় না। পাহাড়-জোড়া চা

বাগানগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গালিচা। কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে শেষ সূর্যের আলো পড়ে কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছিল তা কী বলব। কুকুরী চা বাগানের কাছটাও ভারী সুন্দর। মিরিক, কার্শীয়াং এবং দার্জিলিং এর চেয়ে অনেক নির্জন, অনেক সুন্দর। এখানে কোনো পাহাড়ের উপরে জমি পেলে বাড়ি করতাম।

নির্জনে লেখাপড়া করার এমন জায়গা হয় না।

ইতি

—বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

আমার বিশেষ পরিচিত এক তরুণ দম্পতির প্রথম সন্তান পরমা সুন্দরী ছ মাসের মেয়ে "সকেটি" হঠাৎ মারা গেছে। শোক আমাদের অনেক কিছু বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেয় যা আমরা প্রবহমান জীবন-স্রোতে ভেসে ভুলে থাকি।

ওদের এই চিঠিটা লিখেছি। পড়ে, কালই আমাকে ফেরৎ দিও।

মিনু ও রাহুল,

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই শুনলাম যে, তোমাদের চোখের মণি ছোট্ট "সকেটি" হঠাৎই চলে গেছে।

তোমাদের শোকে সান্ত্বনা দেব এমন মনোবল, পাণ্ডিত্য ও গভীরতা আমার নেই। আজ গিয়েও তোমাদের কাছে মুখে কিছুই না বলতে পেরে ফিরে এলাম। তাছাড়া একাও পাইনি তোমাদের।

প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন বুকে অনেক কথা থাকলেও ; তা মুখে বলা যায় না। কিছু বলতে পারি নি। তাইই এই চিঠি।

আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, তোমাদের শোক যদি তোমাদের একারই বলে মনে করো তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং অন্যদের প্রতিও অবিচার করবে।

তোমাদের দুঃখে ও হতাশায় তোমরা দুজন একা নও। সকলেই তোমাদের দুঃখ সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছে। ভাগ নিয়েছে তোমাদের দুঃখের, এমন একজনের জন্যে, যে কথা বলতে জানতো না, যে তোমাদের মা-বাবা বলে এখনও ডাকতে পর্যন্ত শেখেনি। নাম পর্যন্ত স্থিরীকৃত হবার আগেই যে সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেছে। যার যাবার বড়ই তাড়া ছিলো।

কিন্তু সত্যিই কি সকেটি চলে গেছে ?

আমি জানি, তোমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থায় তোমাদের এ কথা বলা বোধহয় ধৃষ্টতা। তোমরা এও মনে করতে পারো যে, তোমাদের শোকের ভাগীদার আমি নই। মনে করতে পারো যে, তোমাদের কাছে আমি অতি-মানব সাজবার চেষ্টা করছি।

তোমরা গীতা পড়েছো কী না জানি না। না পড়ে থাকলে, পড়ো। শান্তি পাবে। আসলে সকেটি তোমার আমার মত পাপী-তাপী কেউ নয়। আমাদের মত পূর্বজন্মের পাপ তার জমা ছিলো না। ফুলের মত মেয়ে, ফুলের পোশাক পরে তার ছ'মাসের ছোট্ট জীবনের মেয়াদ শেষ করে পরমমুক্তি লাভ করেছে। যারা রইলাম, আমরা সকলে, তোমরা দুজন; হয়ত পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম ও করেছিলে তাইই এই ফুল-হারানোর শোকের ব্যথা আমাদের প্রত্যেকের পাওয়ার ছিলো।

কিন্তু সে তোমাদেরও ছিলো কি ? তোমাদেরই যে ছিল,

সে সম্বন্ধে তোমরা এমন নিঃসন্দেহ কেন? কি করে? সে যাঁর দান, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে সে তোমাদের কাছে এসেছিল, তাঁরই নির্দেশে সে তাঁরই কাছে ফিরে গেছে। এই দুয়ারটুকু পার হতে তোমাদের এবং আমাদের অনেক সংশয় ছিল এবং আছে। কিন্তু শিশু নিঃসংশয়ে সেই দুয়ার পেরিয়ে চলে গেছে। দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তার বেশীদিন থাকতে ভালো লাগেনি; তাইই চলে গেছে। চিরদিনের ঘরে।

গীতাতে "নান্যং ছিন্বন্তি পাবকঃ" ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আমি রাধাকৃষ্ণানের ইংরেজী ভাষ্যে গীতা পড়েছি। সংস্কৃত জানিনা বলে। উনি লিখেছেন: "The Bhagabatgita speaks of the spirt of man as immortal.

Weapons do not cleave the self, fire does not burn Him, water do not make Him wet, nor does the wind make him dry.

He is uncleavable, He cannot be burnt, He can be neither wet nor ried, He is immortal, eternal, all pervading, unchanging, immvrable, He is the same forever."

অন্য এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন:

"Man is more than the sum of his appearences.

When Crito asked Socrates: In what way shall we bury you, Socrates?

Socrates answered : In any way you like, but first catch me ; the real me. Be of Good cheir, my dear Crito, and say that you are burying my body only, and do with whatever is usual and what you think best."

তোমরা কি তার শরীরকেই এত ভালবেসেছিলে? সমস্ত তাকে কি ভালবাসোনি? যদি না বেসে থাকো, তাহলে সে এখন তোমাদের দিকে চেয়ে ও যেমন মিষ্টি হাসি হাসতো, তেমনই হাসছে। যে ডাক ডাকার মত সময় হাতে নিয়ে সে আসেনি, সেই ডাকেই বলছেঃ মা! বাবা! তোমরা কী বোকা! আমার পোশাকটাকেই ভালবেসে, আমার সত্যি আমিকে একটুও ভালবাসোনি তোমরা। তোমরা খুউব খারাপ!

আমি শুনলাম যে, ওকে তোমরা কবরে শুইয়ে রেখেছো। ভালই করেছো। কিন্তু যারা সকলকেই কবরে শোওয়ায় শরীরের জীবন শেষ হলে, তারা কোন্ মন্ত্র পড়ে শোওয়ায়, তা জানলে হয়ত তোমাদের মন একটু শান্ত হতো। হিন্দুধর্মে বলে যে, আত্মা অবিনশ্বর; আত্মার বিনাশ নেই। খ্রীস্টানরা তা বলেন না। কিন্তু শরীরকে কবরস্থ করার সময় তাঁরা যে মন্ত্র পড়েন তার সঙ্গে হিন্দু দর্শনের এতই মিল দেখি যে মনে করতেই হয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে মেনে নিয়েছেন যে, আত্মা অবিনশ্বর।

খ্রীস্টানরা কাউকে কবরস্থ করার সময় বলেন :

"Thou Knowest, Lord, the Secrets, of our hearts, shut not thy merciful ears to our prayar, but spare us, Lord most holy, Oh God most mighty, Oh holy and merciful saviour, thou most worthy Judge eternal suffer us not, at our last hour, for any pains of death to fall from thee."

"We, therfore commit his body to the ground, Earth to Earth, Ashes to Ashes, dust to dust in sure and eternal hope of resurrection to eternal life."

যে রবীন্দ্রনাথ আমার তোমার মত সাধারণ মানুষ নন, তাঁর জীবনে বাইশ বছর বয়সের প্রথম শোকের কী অনুভূতি তা পড়লে হয়ত তোমাদের মন একটু শান্ত হবে। উনি লিখেছিলেন,—

"জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নীরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের জন্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগাইয়া দিল। চারদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি

নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমনকি দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগল এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে এক অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই খানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে!

শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইলাম। জীবন যে একেবারে

অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেওয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম।

যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁকপাড়া কোনো একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম।

আবার সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনই শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।"

তোমরা দুজনেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী। মিন্টুর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই হয়। কিন্তু আমি জানি যে,

জগতের সব বুদ্ধি জড়ো করেও এমন সব মুহূর্তের শোক লাঘব করা যায়না। শোক লাঘব করাটাও ভাল কথা নয়। জীবনে, সমস্ত কিছুরই এক বিশেষ ভূমিকা আছে। জীবনে মৃত্যুর যে ভূমিকা তার চেয়ে বড় ভূমিকা বোধহয় আর কিছুরই নেই। শোকের মত বড় শিক্ষা ও শুদ্ধি বোধহয় হয় না।

কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, যা মৃত তাইই অমৃত। কারণ মৃত্যুর হাত ধরেই আমরা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হই। "যস্য ছায়া মৃতম্ তস্য অমৃতম্"। আসলে আমরা যারা নিঃশ্বাস ফেলছি বা প্রশ্বাস নিচ্ছি তারাও সর্বক্ষণ মৃত্যুর ছায়াতেই বেঁচে আছি। হিন্দুধর্মে বা বুদ্ধধর্মে আত্মার মরণ নেই। আত্মা শুধু পোশাক বদল করে। করতে করতে একসময় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। এ মুহূর্তে এটা বিশ্বাসের কথা। তর্কের কথা নয়, যুক্তির কথা নয়; তোমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থাতে যদি এ কথাটার তাৎপর্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করো তাহলে শান্তি পাবে।

অন্যদের ধর্মগ্রন্থেও, যেমন বাইবেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলছে। বাইবেলে একটা অধ্যায় আছে "The order for the burial and the dead" তার থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি, পড়ে দেখো তোমরা দুজনে।

"We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave

and the Lord hath taken away ; blessed be the name of the Lord".

সব ধর্ম, সব শাস্ত্রই বলছে যে, "He never continues in one stay." তাইই আমাদের বিশ্বাস করতে হয়ই যে, শরীর বদলাতে পারি হয়ত আমরা, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নেই।

Joseph Hall লিখেছিলেন "Death did not first strike Adam, the first Sinful man, nor Cain, the first hyporoite, but Abel, the innocent and righteous—the first soul that met death overcame death, the first soul parted from earth, went into Heaven—Death argues not displeasure, because he whom God loved best dies first,, and the murderer is punished with living."

আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু রাত দুটো বেজে গেছে। তাছাড়া তোমাদের মনকে শান্ত করি এমন সাধ্য আমার কোথায়? শান্ত করলে, তা তোমরা নিজেরাই তা করতে পারবে। বাইরের কেউই পারবে না। দুজনে একা থাকো, খুব কাছের লোক ছাড়া দূরের লোকদের ভীড়ে থেকো না ; বই পড়ো নিজেরাই নিজেদের শোককে বহনযোগ্য করে তুলতে পারবে। শোক ভোলা মানে; সকেটিকে ভোলা নয়।

সে ত আনন্দের মধ্যেই এসেছিল, আনন্দ দিতে এসেছিল, আনন্দের মধ্যেই চলে গেছে ; আবার ও ফিরে আসবে বলেই। হয়ত অন্য নামে, অন্য শরীরে। সকেটি

আছে, থাকবে। তোমরা ওকে সত্যিকারের আপন বলে মনে করো নি, ওকে ওর নিজের মহিমার আসনে বসাও নি বলেই ওর এই লুকোচুরি খেলাতে তোমাদের সমস্ত গড়ে-তোলা স্বপ্ন মনে হচ্ছে গুঁড়িয়ে গেছে। সে আছে· স্বর্গে আছে, যা গুঁড়িয়ে গেছে তা "আমার আমার" বোধ।

আমি যা প্রথমেই বলেছি, তাই আবারও বলছি, সে যে তোমাদেরই দুজনের একারই ছিল এ সম্বন্ধে তোমরা এত নিঃসন্দেহ হলে কি করে? সংসারে আমার বা তোমার কীই বা নিজের? কিছুই যে নিজের নয়, সেই কথাই বুঝিয়ে দেন ভগবান আঘাত দিয়ে।

রাহুল ও মিনু,

তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমরা তোমাদের শোককে সকলের সঙ্গে সমান করে ভাগ করে নাও। ভাগ করে নিয়ে, নিজেদের হালকা করো, ওদের প্রত্যেককে হালকা করো। তোমরা যদি কান্নাকাটি করো, দুঃখে থাকো; তবে সকেটির ফিরে আসতে দেরি হবে টালমাটাল পায়ে তোমাদের কোলের কাছে। তাকে ডাকো; তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নাও। নতুন করে গড়ো, পুরোনকেই মিনু, তোমার শরীরে; রাহুল, তোমার দানে।

ইতি তোমাদের
বুদ্ধদেবদা

চিঠিটা কালই পাঠিয়ে দিও কিন্তু। অত্যন্ত অভিভূত

অবস্থায় লিখেছি বলেই চিঠিটি লিখে অস্বস্তি বোধ করছি। আমি ত তোমাদের মত আঁতেল নই যে সব ভাবাবেগকে গলা টিপে মেরে ফেলাকে শিক্ষার সমার্থক বলে মনে করি!

বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

অবশেষে কাশ্মীরে যাওয়া হলো। সপরিবারে। বাধ্য স্বামী ও আদর্শ বাবার মত।

শ্রীনগরে নেমেই ভালো লাগে। কোনোরকম সন্দেহই থাকে না যে, অন্য রকম একটা দেশে এসেছি। চিনার আর পপ্‌লার। আপেল, উইলো, জাফরানের ক্ষেত, সুন্দরীর ঘন, চাপ চাপ অনুলোমের মত মসৃণ, পেলব নয়নভুলানো সবুজ ঘাস দিকে দিকে। মধ্যে এই। আর চার দিকে মাথা উঁচু বরফাবৃত পর্বতমালা। একদিকে গুলমার্গ রেঞ্জ বড়মূলা; অন্য দিকে চলে গেছে পহলগাঁও, অমরনাথের পথ। অপরদিকে বানিহাল পাস।

শ্রীনগর ছাড়িয়ে পাহালগ্রামের দিকে কিছুটা যেতেই প্রাচীন পপ্‌লার শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সোজা পথের দুপাশে ক্রিকেটের ব্যাটের কারখানা। পাহালগ্রামের কাছাকাছি আসতেই যা সবচেয়ে বেশী চোখ ও মন কাড়ে তা লিডার নদী ও তার উপত্যকা। মেঘ করেছে, লিডার নদী তার এলেবেলে করে বইয়ে দেওয়া শরীর ঘাসের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোনো গাঁওয়ালী কাশ্মীরী মেয়ের মত খিলখিল করে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। লাল ঘোড়ার বাচ্চা চড়ছে উইলো গাছের ছায়ায় নদীর দুপায়ের মাঝের নরম

ঘাসে। উপত্যকা, দূরের বরফ ঢাকা পাহাড়ে, মেঘলা আকাশ, বয়ে-যাওয়া বহুধা বিস্তৃত অগভীর, চপল অথচ সংযমী নদীর রূপ মিলে মিশে এমন এক ছবি হয়েছে যা পৃথিবীর খুব কম প্রান্তেই দেখেছি। আমার মতে, লিডার ভ্যালীর কোনো তুলনা নেই পৃথিবীতে। অন্ততঃ আমার দেখা পৃথিবীতে; যার মধ্যে পৃথিবীর অনেক মহাদেশই পড়ে, আফ্রিকা শুদ্ধ।

পাহালগ্রামে দিন কয় থাকলে তবেই জায়গাটা এবং তার চার পাশ ভাল করে দেখা যায়। আমাদের হোটেলের সামনেই তুদিক থেকে আসা তুটি নদী কত যে ভাগে ভাগ হয়ে বয়ে গেছে! সেই দিকে তাকিয়ে সারা দিন বসে থাকা যায়। বাঁদিকের নদীটি লিডার। ডানদিকের নদীটি এসেছে অমরনাথের পাহাড় থেকে—শোনমার্গ থেকে (?)। অমরনাথের পথে চন্দনবাড়ি যেতে, পথে সেই নদীটির শোভা মনকে বিবাগী করে দেয়। মনে হয়, চিরদিনের জন্যে এখানেই থাকি এসে। একটা জায়গাতে নদীটা একটা ফাঁসির লুপের মতো হয়েছে। চন্দনবাড়ির উঁচু পথ থেকে নীচে নদীটা আর সবুজ উপত্যকার দিকে চেয়ে মনে হয় চাঁদনী রাতে জিন-পরীরা ওখানে নিশ্চয়ই খেলতে নামে। এমন জায়গাতে পরীরা না খেলবে ত কোথায় খেলবে তারা ?

সারা-তুপুরে কাঁসা রোদে ঘোড়ারা চড়ে বেড়ায়, সৃষ্টির প্রথমে তাদের যে স্বাধীনতার অঙ্গীকার বিধাতা করেছিলেন পরে স্বার্থপর মানুষ যে অধিকার কেড়ে নেয়; সেই প্রাচীন

প্রমত্ত অধিকারে। ওখানে দাঁড়িয়ে নীচের নদী ও উপত্যকার দিকে চাইতেও ভয় করে, পাছে চোখের ছোঁওয়াতেও তাদের সৌন্দর্য কলুষিত হয়; অপার্থিব স্বর্গীয় পেলব উপত্যকার গায়ে ব্যথা লাগে।

চন্দনবাড়ির বরফের ব্রিজ। যাওয়ার পথে বরফের উপর দিয়ে ঘোড়াতে যাওয়া। কতগুলো সংকীর্ণ জায়গা পেরুতে হয় গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে। সোহিনী এবং তার মায়ের ভয় লাগে। আমার ভালো লাগে।

চন্দনবাড়ির পথে প্রায়ই হাঁটতে যেতাম। দোকানি বন্ধু হয়েছিল। ওদের মাটির উনুনে বানানো সেঁকারুটি, কাশ্মীরী লালচে-নোনতা চা এবং গড়গড়ী-কাম হুকোর তামাক খেলাম। ওদের তামাক পাইপে ভরে দেখলাম, খেতে মন্দ লাগে না কিন্তু গড়গড়ার তামাকের মতই বড় আঠা-আঠা। পাইপে ভরলে, পাইপ ধরে না। ওদের কবরের উপরে রাশ রাশ সাদা পপির মতো নার্সিসাস ফুটে থাকে। নার্সিসাসই ত! নদীর জল বয়ে যায় কুলকুল করে দোকানের সামনে দিয়ে, ঘরের পাশ দিয়ে; বাজারের মধ্যে দিয়ে। বছরের সাতমাস বরফ-চাপা থাকে আর পাঁচ মাস প্রকৃতি ফ্রিজ থেকে বের হয়ে এসে তাঁর রূপের জেল্লা দেখায় এখানে।

শীতকালে, চারদিকে বরফ, শুধুই বরফ। ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়। গরমে জড়ো করে রাখা শুকনো ঘাসপাতা খায়, মানুষ পশ্চাৎদেশের নীচে কাঙ্‌রি রেখে বসে বসে হুঁকো

খায়, শাল বোনে, উল বানায়, ঝগড়া করে আর স্ত্রীদের অকাতরে গর্ভবতী করে। কাজ নেই ত, খই ভাজ। খই ফুটে বাচ্চা হয় নির্বিবাদে সবুজ উষ্ণতায়।

গোলবাবার দোকানে গিয়ে বেজায় গোল বাধল। ব্যবসায়ী মাত্রই ভালো কথা বলেন। এবং সেটা জানা সত্ত্বেও সেই ব্যবসায়ীর কাছে ঠকাটা মুর্খামি। ছুটিতে গেলেই আমার যেটুকুবা বুদ্ধি আছে তা শ্লথ ও ভোঁতা হয়ে যায়, আমার ছুটির চেহারারই মত। লাভের মধ্যে "খ্‌ৱাওয়া" খেলাম। দারচিনি, এলাচ, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে বানানো। ঠাকুমার পাঁচনের মত। ফারল্‌ট ক্লাস।

কাশ্মীরীরা বাঙালীদের মতোই ভাত খেতে ভালবাসে। শ্রীনগর উপত্যকাতে যে চাল হয় তা গোলগোল, মিষ্টি খেতে। তবে আজকাল সার এবং কৃত্রিম-সার পড়ে আদি স্বাদের সর্বনাশ হয়েছে। "গোস্তাবা" খায় ওরা। বিরিয়ানি পোলাউ দই মাংস। খেতে এসব বিশেষ আহামরি নয়—এর চেয়ে আমাদের উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের রান্না অনেক ভালো। "আহডুস্" রেস্তোরাঁতে ভাল কাশ্মীরী খাওয়ার পাওয়া যায়, শ্রীনগরে।

এখন চেরীর সময়। ছোট চেরীগুলো বেশী মিষ্টি। ডাবলচেরী টক্। তবে তাড়াতাড়ি পচে যায় না। শ্রীনগরের চশমাশাহী (ফাউন্টেন অফ্ দ্যা শাহ্) নিষাদ বাগ, শালিমাম এই তিন বাগান দেখার মত। হজরত্‌বালের লালচে-সাদা

পাথরের মিনার আর গম্বুজ দেখার মত। বোধ হয় স্যাণ্ডস্টোনের। চার-চিনার ডাল লেকের মধ্যে। চারটি চিনার গাছ। ডাল লেকের পাশে বুলেভার্ড। যুবরাজ করণসিং-এর বাড়িতে ওবেরয় প্যালেস্ হোটেল। থাকবার মত নয়। বড্ড খরচ।

হাউস বোটের জীবন চমৎকার।

সোহিনী স্থলতানের সঙ্গে বসে মাছ ধরত, ছেড়ে দিত আবার। শিকারা করে ফুল, ফল, স্টেশানারি বিক্রি করতে আসত। সন্ধ্যেবেলা যখন আলো জ্বলে উঠত বোটে বোটে উল্টোদিকের আরবদের ডিল্যুক্স-বোটে লাল-নীল আলোর মালা ছুলত, আর সেই মালার ছায়া কাঁপত জলে ; তখন মনে হত আরব্য রজনীর কোনো গল্পই জীবন্ত হয়ে উঠল বুঝি বা।

উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছায়াচ্ছন্ন সংকীর্ণ জলপথে শিকারায় বেড়ানো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ফর্সা, স্থন্দর, সাদাটে-লাল ছেলেরা জলে চান করছে, সাঁতার কাটছে, হাঁস প্যাঁকপ্যাঁকাচ্ছে, তরুণী হাউসবোটের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাসন ধুচ্ছে, নৌকার ঘরে বসে সাদা-দাড়ি-বুড়ো তামাক টানছে।

আরও এগিয়ে গেলে ভাসা-বাগান। বাগান চুরি হয়ে যায় মাঝে মাঝে। নৌকা চালিয়ে দড়িতে বেঁধে অন্যত্র নিয়ে চলে যায়। সাদা ধবধবে শিকারা সাদার উপর লাল অথবা

নীল অথবা হলুদ কাজ করা শিকারা। আর রঙিন শিকারার ত কথাই নেই।

ডাল লেকের জল তত গভীর নয়। যে দিকটা খোলা সেই দিকটার জল অবশ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু নাগিন লেকের জল গভীর। ওয়াটার-স্কীয়িং, সুইমিং এবং বোটিং করে সকলে এখানে।

কাশ্মীরীদের হাতের কাজ দেখবার মত। পার্সীয়া থেকে গালচে, পেপার-মেশি (ফরাসী দেশ হয়ে), এবং কাঠের কাজের তুলনা নেই। আখরোট, পাইন, পপ্‌লার, চিনার সব গাছের কাঠ দিয়েই কিছু না কিছু তৈরী হয়। আমার মনে হয় বছরের বেশীর ভাগ সময়ই বরফে ঢাকা থাকে বলে ঘরের মধ্যে বসে যে সব কাজ করা যায় সেই সব কাজের উৎকর্ষ হয়েছে এখানে। সুচীশিল্প, ছুতোরের কাজ, গালচে বোনা ; সবকিছু।

শাহতুষ-এর শাল ও মলিদা এখন কম পাওয়া যায়। ঈগলের মত একরকমের বড় পাখি পাওয়া যায় তিব্বত এবং লাদাক্ এ। সেই পাখিগুলোর গায়ে এমন কিছু শক্তি হঠাৎ জেগে ওঠে বিদ্যুতের মত যে তারা যে-কাঁটা গাছে বসে, সেই কাঁটা গাছে তাদের লোম আটকে যায়। সেই লোম কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে তা থেকে শাহতুষ হয়। তিব্বত চীনারা নিয়ে নিয়েছে। লাদাকেও যে পাখি আছে তার সংখ্যা সামান্য। শিকারিরাও আগে আগে এ শাহতুষ-এর জন্যে

শিকার করে সেই পাখি শেষ করে দিয়েছে। শাহতুষ যতই কম উৎপন্ন হচ্ছে ততই তার দাম বাড়ছে। বাবার একটি শাহতুষ-এর আলোয়ান আছে। সেইটির মত একটির দাম আজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

পেপার-মেশি ও কাঠের কাজও দেখার মত। পেপার-মেশির কাজ ত দু'হাজার বছর অবধি থাকে। বুড়ো বুড়ো কারিগর তাদের নিজেদের তৈরী ভেষজ রং-এ কাগজের মণ্ডের উপরে যে কত কী কারুকাজ করে তা বলার নয়। এই সব রইসী জিনিসের কদর করার মত লোক আজকাল কমে গেছে। ভারতবর্ষে বড়লোক অনেক আছেন কিন্তু আজকাল-কার বড়লোকদের কৌলিন্য নেই সেই অর্থে। টাকার প্রকৃত ও যথার্থ ব্যবহার যাঁরা জানেন না, টাকা তাঁদেরই হাতে এসে জমা হয়েছে।

গুলমার্গ এলাম তানমার্গ হয়ে। ছোট্ট জায়গা। হাইল্যাণ্ড পার্ক হোটেল আর নেডুস্ হোটেল। নেডুস্-এর চারদিকে গলফ্ লিংকস। গুলমার্গ এর সৌন্দর্যই আলাদা। বরফের জন্যে। পাইন গাছ। ছোট ছোট সাদা রেঁায়ার ফুল। সোহিনী উইশ্ করত। ড্যাণ্ডিলিয়ন্ পাইনের কোণ। নির্জনে কটেজ। আর্মির হেলিকপ্টার নামত রোজ নীচে। বোধহয় বিগ্রেডিয়ার বা ফুল-কর্নেলকে নিয়ে যেত উপরে। প্রায় একশ বছর আগের হোটেল—পাইন কাঠের—হট ওয়াটার বটল—ক্রুড রুম হিটার, প্লাস ইলেকট্রিক হিটার। ভেড়ার মাংস।

খিলানমার্গ। সর্দারজীদের ধাবা। জমে-যাওয়া নদীতে বেদনাদায়ক স্লেজ আরোহণ। কাঠের ডাণ্ডার ব্রেক। দুর্গন্ধ চালক। নাক ভাঙার অতীব সোজা রাস্তা। ঘোড়ার চাঁট। খাইনি। খেতে নিশ্চয়ই উপাদেয়।

শিকারা করে নতুন শ্রীনগর বেড়ানোর অভিজ্ঞতা লোমহর্ষক। ব্রিজগুলোর নীচে বিপদ। চান করার কাঠের ঘর। সিঁড়ি দুপাশে। ঝালেম্ নদী। নৌকার জীবন। বড় নৌকার গুনটানা। শিকারায় তিনজন দাড়ি। তাও ডোবো ডোবো।

রাতের বেলা ডাললেকে শিকারাতে। ছাদের বাগান। ছাতা, ইজিচেয়ার, অলস দিন, ছুটি, ছুটি, ছুটি।

পরের কাজ থেকে ছুটি, নিজের কাজ থেকে ছুটি; নিজের কাছ থেকেও ছুটি।

ইতি

বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

অপর্ণাকে ব্যাক্তিগত ভাবে আমি ছ'বছর হল চিনি। ইনক্যামট্যাক্সের ঝামেলা নিয়ে ডাবর কম্পানীর প্রদীপ বর্মনের সুপারিশে ও আমার কাছে প্রথম আসে। তখনও মুকুল শর্মার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি, কিন্তু সঞ্জয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

আমি ওর স্তুতিকার হয়েছিলাম প্রথম মানিকদার সমাপ্তি দেখে। তিনকন্যার সমাপ্তি। তখন সত্যজিৎ রায়ও আমার কাছে একটি নামই ছিলেন। যদিও বড়বৌদির আত্মীয় হিসেবে দেখেছি তাঁকে, আমার বিয়ের সময় থেকেই ঋতুদের বাড়ির সমস্ত অনুষ্ঠানে।

অপর্ণার (রীণার) সঙ্গে আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিতুদার সঙ্গে আলাপ হল, যখন প্রথমবার নিউ-আলিপুরের ভাড়া বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করল ও। চিতুদাকে আমার দারুণ লেগেছিল। আমি অনেকানেক অব্রাত্ম-ব্রাত্ম দেখেছি। অতি ব্রাত্মও দেখেছি। নাতি-ব্রাত্মও। কিন্তু যথার্থ ব্রাত্ম, চিতুদার মত, খুব কমই দেখেছি।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও সত্যজিৎ রায় খুব বন্ধু এ কথা আগেই জানতাম। কিন্তু চিতুদার সঙ্গে আলাপিত হবার পরে চিতুদার মিষ্টি ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের কাছাকাছি এসে দুই বন্ধুর সম্বন্ধে

খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলাম। মানিকদার সঙ্গে চিতুদার তফাৎ হচ্ছে এই যে, মানিকদার কাছে বসে থেকেও কাছে যাওয়া যায় না ; চিতুদার দূরে থেকেও কাছে যাওয়া যায়। অবশ্য যে-কোন অতিব্যস্ত লোকের পক্ষেই একটি দূরত্বের নির্মোক গড়ে তোলা নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই প্রয়োজন। অতি-ব্যস্ত না হলেও কেবলমাত্র ব্যস্ত বলেই, আমিও এ কথা বুঝতে পারি।

রীণা নিউ আলিপুরের বাড়িতেই নেমন্তন্ন করে প্রথম শর্ষে মুরগী খাওয়ায়। সে পার্টিতে চিতুদা-বৌদি, টিটো (দীপংকর দে) এবং রীণার অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু ও মুকুলও এসেছিল। এর পর আরেকবার গেছিলাম দোলের দিন ওদের নেমন্তন্নে, যখন মে-ফেয়ারের ওনারস্ কোর্টে ওরা একটা ছোট ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকত বিয়ের পর। গোপা দারুণ গান গেয়েছিল। এবং আমার খারাপ গান। তারও পর একাধিকবার আলিপুরের ফ্ল্যাটে। রীণা-মুকুলের ফ্ল্যাটের বাইরে ইলেকট্রিক কলিং-বেল ছিলো না—একটা ঘণ্টা ঝুলোনো থাকত। সেই ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকতে হত। ঘণ্টাটা এখনও আছে। ওদের ফ্ল্যাটের উপর-তলাতেই ছিল প্রীতীশের ফ্ল্যাট। প্রীতীশ নন্দী।

অপর্ণার ইংরিজি, বাংলা এবং সংস্কৃতেরও জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হতাম। একবার সস্ত্রীক এফ জে জিলানীকে নিয়ে গেছিলাম ওর কাছে ফিল্মের আলোচনা করতে। জিলানী তখন এখানের সিনেমা সার্কেল-এর কমিশনার ছিলেন এবং নানা ম্যাগাজিনে,

সান্‌ডে, ডেবোনেয়র, ইত্যাদিতে ফিল্ম সম্বন্ধে এবং নাটক সম্বন্ধেও লিখতেন। জিলানীর সঙ্গে রীণা ঘণ্টাখানেক ফিল্মের উপরে যে আলোচনা করেছিল, ইংরিজিতে, তাতে ওর ইংরিজি উচ্চারণ, ফিল্মের প্রসঙ্গে অসাধারণ জ্ঞান ও শব্দচয়ন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। জিলানীর ইংরিজি ও ফিল্মের জ্ঞানও অনেকের কাছে সুবিদিত ছিল।

যাইই হোক, এতদিন অসাধারণ ভাল অভিনেত্রী, সাহিত্যানুরাগী, এবং সবচেয়ে বড় কথা এই সমাজ এবং সমাজের লোকজন সম্বন্ধে ওর যে প্রচ্ছন্ন ঘৃণা-মেশা উদাসীনতা ছিল তা আমাকে মুগ্ধ ও খুশী করত। খোলস ও মুখোস সর্বস্ব এই সমাজকে না-মানতে পারলে খুশী হয় অনেক লোকই। কিন্তু সমাজকে অখুশী করতে চাওয়ার পেছনে যে সাহসের প্রয়োজন তা অনেকেরই থাকে না। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য চাপা নিষ্ঠুরতাও দেখতে পেতাম—যার কারণ হয়ত একান্তই ওর ব্যক্তিগত। সেই নিষ্ঠুরতার কোনো আভাস, আমার সঙ্গে ওর নিতান্তই বহিরঙ্গ-সম্পর্কে কখনও এসে পৌঁছোয় নি—কিন্তু আমার অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারতাম যে; সেই নিষ্ঠুরতা ওর ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে সবসময়।

মুকুল-রীণা তারপর একদিন ম্যাকলাস্কিগঞ্জে আমার বাড়িতে গেল বেড়াতে। তারপর আমার বাড়ি যদি কখনও বিক্রি করি তাহলে ওদের যেন বলি এ কথা বলে গেল ওখান থেকে ফিরে। তারপর হঠাৎই বাড়ি বিক্রি করা মনস্থির করাতে

বাড়িটা ওদেরই বিক্রি করে দি।

রীণার সঙ্গে বিশেষ কথা বা দেখা হতো না ইদানীং। ট্যাক্সের ব্যাপারে মুকুলই যাওয়া-আসা করত। অনেকদিন যাওয়াও হয়নি ওদের বাড়িতে। সম্পর্কটা আস্তে আস্তে মক্কেল-উকিলের সম্পর্ক হয়ে উঠছিল। চিতুদা দিল্লীতে চলে গেছিলেন SPAN এর সম্পাদক হয়ে যাবার পর ওঁর কোনো আত্মীয়ার ট্যাক্স-সংক্রান্ত ব্যাপারে দু তিন বার চিঠি লিখেছিলেন। তারপর কোনোই যোগাযোগ ছিলো না।

ঠিক তখনই একদিন মুকুল ফোন করল 36, Chowrangee Lane দেখতে যাবার নেমন্তন্ন করে। অত শর্ট্ নোটিস্ এ যাওয়া হলো না। পরে একদিন দুটো টিকিট পাঠালো ইভনীং শোর, শুক্রবারের। সেদিনও টিকিট নষ্ট হলো। অফিস থেকে কিছুতেই সাড়ে-সাতটার আগে বেরোতে পারলাম না। পরে, নিজেই টিকিট কেটে দেখতে গেলাম এক শনিবারে।

ছবি দেখলাম। রীণাকে গভীরভাবে ভালো লাগত ওর মুখশ্রী এবং নানা গুণের জন্যে। কিন্তু ছবিটা দেখে, সেই ভালোলাগাটা হঠাৎই শ্রদ্ধাতে গড়িয়ে গেল।

বহুদিন এত সুখমিশ্রিতদুখানুভূতিতে আপ্লুত হইনি বলেই মনে হল। ওর ছবির নানা রিভিউ নানা কাগজে পড়েছিলাম তার আগে। কিন্তু ছবি দেখে মনে হল পূর্ণেন্দুর মত ফিল্ম লাইনের অসাধারণ লোকেদের চোখেও কতগুলো সাধারণ ও ছোটাখাটো জিনিস পড়েনি। পড়লেও, অন্তত তাঁদের

সমালোচনাতে তা প্রকাশিত হয় নি।

জেনিফারের অভিনয় যে ভাল সে ত কিণ্ডারগার্টেনের ছেলেও বলবে, কিন্তু ছবিতে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবে টি-টি বা অন্যান্য পাখির একলা স্বর, জেনিফার ডেফিডের সম্পর্কের ফ্ল্যাশ-ব্যাক ; ব্রাইডাল রোব-পরা জেনিফারের স্বপ্নের বাড়ি পেরিয়ে কফিনের কাছে গিয়ে পৌঁছনোর সেকোয়েন্সের মাধ্যমে যে অকৃতজ্ঞ নীচ, খল ও ভণ্ড মানসিকতা সম্পন্ন অল্পবয়সীদের অপর্ণা বিধৃত করেছে তা হয়তো ওদের প্রজন্মের যথার্থ প্রতিফলন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই নিজেকে সুন্দর দেখে, কিন্তু আয়নায় নিজেদের যথার্থ প্রতিফলন ফেলতে ও তা দেখে তার পূর্ণপ্রতিফলন করতে বুকের জোর এবং নিজের উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।· জেনিফারের ভাই এর অভিনয়ও অসাধারণ। ধৃতিমান এবং দেবশ্রীর চরিত্রে অভিনয়ের কিছু ছিল না—তাই তাদের অভিনয়ের মূল্যায়ণ এই ছবিতে করা অপ্রাসঙ্গিক।

আশ্চর্য সুন্দর ছবি। এই কোলকাতা শহরকে বড় ভালো-বেসে, বুকে জড়িয়ে ধরে করা ছবি। প্রায়, নিখুঁত। বহু ভাল ছবি দেখার পরও যখন হল থেকে বেরিয়েছি তখন নানা লোককে নানা বিরূপ কথাও বলতে শুনেছি। কিন্তু ৩৬, চৌরঙ্গী লেন, দেখে বেরুবার পর কারো মনে কোনো কথা ছিলো না। প্রথমবার সমুদ্র অথবা হিমালয় দেখে মানুষ যেমন স্তব্ধ হয়ে যায় বিস্ময়ে, মুখে কথা সরে না একেবারে ; তেমন অবস্থা।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, একেবারে সামনে বসে যাঁরা ছবি দেখলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইংরিজিও জানেন না, তাঁদের মুখেও কোনো কথা নেই। অপর্ণার সবচেয়ে বড় পুরস্কার এইই। এর চেয়ে বড় কোনো পুরস্কার কোন্ শিল্পী আশা করতে পারেন ?

ছবির খুঁত বলতে, আমার যা মনে হয়েছে ; অবশ্য আমি ফিল্মের কিছুই বুঝিনা ; সাধারণ দর্শক হিসাবে, তা এইই।

১। পুরোনো গ্রামোফোনটা বারংবার সিম্বল্ হিসাবে ব্যবহার করায় সিম্বল্ হিসাবে তার ধার ভোঁতা হয়েছে।

২। বাথরুমে বেড়াল খোঁজার সময় ব্রেসিয়ার-পরা দেবশ্রীর ব্লাউজের হাতার মধ্যে হাত ঢোকাতে বড্ড বেশী সময় লেগেছে। এই রকম নিখুঁত ছবিতে এ একটি খুঁত। সম্ কেটে যায় এতে।

৩। ঝড়ের বিকেলে জেনিফার স্কুল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন দরজা খোলা, তালা-ভাঙা এবং শুকনো পাতা ঝরনার পাতা তোড়ে ঢুকছে ঘরে সেই পুরো দৃশ্যটি যথেষ্ট লাউড এবং প্রোলোঙ্গড এবং ইমপ্রাকটিকেবল্ বলে মনে হয়েছে। অত উঁচুতলার ফ্ল্যাটে অত রাশি রাশি ঝরা-পাতা আসা বস্তুত অসম্ভব। অতটুকু ফ্ল্যাটে তালাভাঙা দরজাটা অমন বিকট শব্দ করলে অতক্ষণ ধৃতিমান-দেবশ্রীর পক্ষে না-শোনা এবং অতখানি দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য হওয়াও অসম্ভব ছিল তারা শারীরিক সান্নিধ্যে, যতই ঘনিষ্ঠ থাকুন না কেন।

৪। চুরিকরা, প্রিমারিটাল লাভ-মেকিং-এ যে উত্তেজনা আবেগ এবং রক্ত-চাপ বৃদ্ধি ঘটার কথা ছিল, তার কিছুই ফোটেনি ধৃতিমান এবং দেবশ্রীর অভিনয়ে। সপ্রতিভতাই অভিনয়ের একমাত্র গুণ কখোনোই হতে পারে না। অভিনেতাকে প্রতি-মুহূর্তে নিজেকে ভেঙে গড়তে হবে। সপ্রতিভ অভিনেতা অপ্রতিভ হতে পারলেই অভিনয়ের মান বাড়ে।

৫। ৩৬, চৌরঙ্গী লেন গলিতে জর্জদার গান একেবারেই বে-মানান। কোনো হিন্দী ফিল্মের গান অথবা সস্তা ইংরেজী গান বাজানো উচিত ছিল।

৬। পার্টি-সীনটি আর্টিফিসিয়াল বলে মনে হয়েছে। বড় সাজানো।

যাইই হোক, অপর্ণা অসাধ্য-সাধন করেছে।

তবে প্রথম উপন্যাসের মত প্রথম ছবিতে সফল হওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক। অপর্ণা কত বড় নির্দেশক তা প্রমান হবে ওর দ্বিতীয় ছবিতে। যে-ভুল অনেক বড় বড় পরিচালকও করে থাকেন, আশা করি অপর্ণা সেই ভুল করবে না। বারবারই নিজের গল্প নিয়ে ছবি করবে না আশা করব। যদি প্রতিবার নিজের গল্পে অসামান্য দেখাতে পারে তাহলে তাকে প্রতিভাবতী বলে মেনে নেবো।

কিন্তু ছোটদের গল্প ছাড়া প্রবাদপুরুষ মানিকদাও যে ক্ষেত্রে এ দেশে আংশিক অসফল হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে যদি রীনা ব্যতিক্রম হয়ে উঠতে পারে, তাতে আমাদের আনন্দ ও গর্বের শেষ থাকবে না।

শুধুমাত্র এই কারনেই সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ এবং পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখকে আমি কখনও বার্গম্যান বা আন্তোনিওনি বা কুরাসাওয়ার সঙ্গে একাসনে বসাতে রাজী নই। শেষোক্ত কজন ছবি না করে, যদি শুধু লিখতেন, তাহলেও হয়ত নোবেল পুরস্কার পেতেন।

ফিল্মীওয়ালারা মনে করেন ছবিই সব। যাঁরা ভাল ছবি করতে পারেন, তাঁরা ইচ্ছে করলেই ভাল লিখতেও পারেন। কিন্তু যাঁরাই একটু-আধটু লেখালেখি করেন, তাঁরাই জানেন যে, কোনো কিছুই চালাকি করে হয় না। ভালো ছবি যেমন হয় না এক রাতের সাধনায়, ভালো লেখাও হয় না। লেখা বা গান এ সব ফিল্ম-মেকিং এর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট শিল্প এমন একটা জিগির এই সস্তা, মেকী ও "জনগনের দাবীর" দিনে ধীরে ধীরে সোচ্চার হচ্ছে বুঝতে পারছি। অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক ও ইলেকট্রনিক্সের-এর উন্নতির কারণে ফিল্ম হয়ত অনেকখানি জায়গা নিয়েছে তবে আমার মনে হয় সাহিত্য ও গান, ফিল্মীওয়ালাদের দয়া-দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকেই, তাদের নিজগুণেই সময়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে।

এ দেশে ত নিশ্চয়ই হবে।

শিল্পে কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড়ো নয়। যে-শিল্প বা শিল্পী, অন্য শিল্প বা শিল্পীকে ছোট চোখে দেখে বা দেখেন তাঁর নিজের শিল্পগুণ ও শিল্পীগুণ সম্বন্ধে করুণা প্রদর্শনের কারণ আছে। এবং আমার বিশ্বাস চিরদিনই থাকবে।

ইতি—তোমার বুদ্ধদেবদা

বড়বিল, উড়িষ্যা

মহুয়া,

আবারও পলাতক।

চৈত্রমাস এলেই জঙ্গলের ঝরা পাতার আসাকে ডাক পাঠায়। মন বড় উচাটন হয়। চোত-বোশেখের জঙ্গলের পূর্ণিমার জন্যে মন কেমন করে।

যাওয়ার কথা ছিল মধ্যপ্রদেশের কানহাতে। জব্বলপুর হয়ে। শেষ মুহূর্তে যাওয়া হলোনা। তাই গতবার পুজোয় যেমন করেছিলাম, পূর্ণদের ফোন করে মনোজকে হাওড়া স্টেশানের ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। তারপর সাড়ে সাতটা নাগাদ ওকে তুলে নিয়ে আন্দুল হয়ে বম্বে রোডে পড়লাম।

ঘাটশীলা, মৌভাণ্ডার—হলদপুকুর—হাটা হয়ে, চাঁইবাসা, হাটগামারীয়া-বড়জামদা-বড়বিল। পৌঁছলাম যখন, তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে। মিত্র এস-কের গেস্ট হাউসে তপন কুমার ব্যানার্জী এবং সুধীররঞ্জন সেন এসে অভ্যর্থনা করলেন। চন্দ্রভান মজুদ ছিল। বাসমতী এবং পানুইও ছিল।

পরদিন সকলে ওঁদের জীপেই রওয়ানা হলাম। রাউরকেল্লার রাস্তাতে কইরাভ্যালী অবধি গিয়ে রাউরকেল্লার পথ ছেড়ে কাঁচা পথে ঢুকলাম। উঁচু নীচু আয়রন ওরের লাল ভারী

ধুলো মাখা জঙ্গলের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল পাহাড়ের এবং পাহাড়ী নদীর সঙ্গমে এসে মন ভরে গেল—গা মাথা ভরে উঠল আবীরের মত লাল-রঙা ভারী ধুলোয়।

সারকুণ্ডাতে এস লাল কোম্পানীর লোহার খনি আছে। চমৎকার জায়গা। কুড়ারি নদীর রূপ এখানে বড় সুন্দর এবং আরও সুন্দর তার অববাহিকা। সারকুণ্ডার পরই শুরু হল খাড়া চড়াই—বড়, খুব উঁচু একটা পাহাড় চড়েই আবার উৎরাই। এসব অঞ্চলে সমতলের পথ খুবই কম। শুধুই পাহাড়ের পর পাহাড়। এই সমস্ত পাহাড়-বন উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার মধ্যে পড়ে। কখনও আসিনি এই জেলাতে এর আগে।

মহুলশুখা ম্যাঙ্গানীজ মাইনে এসে পৌঁছলাম। পথে কুড়ারি নদীকে যে কতবার পেরুলাম তার ইয়াত্তা নেই। মহুলশুখাতে ঢুকতেও পেরুতে হয়। মেয়েরা নগ্ন হয়ে চান করছে নদীতে বাঁধ বেঁধে। বেশীই হো, মুণ্ডা ; আদিবাসি সব। ভারী সরল আর ভাল, এখনও।

মহুলশুখা এরীয়ানস্-এর মাইন। এরীয়ানস আসলে জার্ডিন হেণ্ডারসনেরই একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী। শুনলাম, ম্যানেজার আগ্রার লোক। এম ডি গোয়েল—বিপত্নীক। এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুশ্রী ছটফটে ধর্মদাস মিশ্র। মুজাফ্ফর-পুরের লোক। বৌ ছেলে থাকে সেখানে। ক্ষেতি জমিন আছে —বাবা মা নেই। চাচা-চাচীর কাছে বৌ ছেলেকে রেখে এই

জঙ্গলে পড়ে আছে। ডিস্‌পেনসারীর ওড়িয়া ডাক্তার মিশ্র। সুন্দরগড়ের কাছে বাড়ি। সম্বলপুর থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছে। বাঙালী মুৎসুদ্দিবাবু।

ওড়িয়া দুটি ছেলে। সুরেন্দ্রকুমার কর ও দ্বারিকানাথ পাত্র। জেনারেটর অপারেটর আর্তমোহন মহাপাত্র। চৌকিদার। বিহারের লোক, ম্যালেরিয়া আর পেটের রোগে প্যাঁকাটি হয়ে গেছে। চারদিকে বড় বড় মহানিম গাছ। উজ্জ্বল কুসুমপাতার মত লাল রঙা পাখি—অচিন পাখি কখনও আসে, কখনও আসেনা।

মহুলশুখার কথা বিস্তারিত লিখব এবার আনন্দলোকের পুজো সংখ্যাতে বড় করে, তাই এখানে আর লিখলাম না।

মহুলশুখা থেকে আরও এগিয়ে গেলে বারসুঁয়া-রেল স্টেশান। আর খণ্ডাধার ওড়িশা মাইনিং করপোরেশনের মাইন। উনিশ'শ বাষট্টি সনে বিজু পট্টনায়েক শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ মশাইকে চেয়ারম্যান করে ওড়িশা মাইনিং করপোরেশান ওপন্ করেন।

খণ্ডাধার ফলস্ বিখ্যাত। উল্লেখ করার মত জলপ্রপাত। কিন্তু কুড়ারি নদীর জন্মদাত্রী নয়।

মহুলশুখার সব ভাল। শুধু আমার খিদ্‌মদগার পদ্মলাভ যদি না খাবার ঠাণ্ডা করে আনত এবং চা টাও ঠাণ্ডা না করত প্রতিবার; তাহলে হয়ত থেকে যেতাম আরও কদিন। তাছাড়া, সন্ধ্যে হতে না-হতেই জেনারেটর এর গুন্‌গুনানী এবং চাঁদের আলোর সর্বনাশ। অথচ চাঁদ দেখতেই ত'

এই সময় যাওয়া। তাইই চলে এলাম।

ফিরে এসে বড়বিলে ত' রৈ-রৈ ব্যাপার। রোজই মুনলাইট পিকনিক। ইণ্ডিয়া ট্রেডস কোম্পানীর অভিজিৎ (এণ্টু রায়), শান্তি চ্যাটার্জী, এইচ এস্ এল এর কে জি ঘোষ (কৃষ্ণগোপাল), এস্ লাল এর ঠাকুরাল আর শর্মা, মিত্র এস কের সুধীরকুমার সেন, প্রণব বাবু, বিপ্লব বাবু (কেমিস্ট), হাজরাবাবু (ক্যাশিয়ার) ব্যাচেলর দাড়িওয়ালা মাইতি, (বিপ্লবও ব্যাচেলার), ব্রিগস্ কোম্পানী এর ভট্টাচায্যি সাহেব। দুর্গাপুর স্টীলের সান্যালবাবু।

পরদিন কুম্‌ডি গেলাম। থল্‌কোবাদে জায়গা পাওয়া গেলোনা। তার আগের দিন আত্রেয়ী ও আহলুয়ালিয়া; দুই কনট্রাকটরের সঙ্গে দেখা হল। চা-পান খাওয়ালো। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সর্দারজী কাং। এর সঙ্গে খুব ভাব।

গাঙ্গুলী ও যাদব ড্রাইভার এবং চন্দ্রভান আমার সঙ্গে চলল ম্যানেজার ব্যানার্জীবাবুও। মনে হল, ওঁরা আমার মাধ্যমেই জঙ্গল এবং জঙ্গলে চাঁদের আলোর স্বরূপ প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। ভগবান মানুষকে চোখ দেন বটে কিন্তু সেই চোখ দিয়ে দেখা বা কান দিয়ে শোনার ক্ষমতা পরিপূর্ণ ভাবে সকলকে দিয়ে পাঠান বলে মনে হয় না। অথচ সেনবাবু ও ব্যানার্জীবাবুর বড়বিলেই আবাস। একজনের বাবা বাড়ি করে স্থায়ী বাসীন্দা এখানের। অন্যজনের বাবাও এখানেই ছিলেন এবং জন্মস্থানও বড়বিলে।

বড়জামদাতে ফিরে এসে কিরিবুরুর রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে ফরেস্ট গেটএ পৌঁছলাম বড়াইবুরুতে। লেখা আছে ল্যাণ্ড অব সেভেন হ্যানড্রেড হিলস্। ব্রিটিশদের সময় একেবারে গুনে গেঁথে রেখেছিল তারা। সাতশ পাহাড়ের দেশ। সারাণ্ডা ডিভিশানের ভিতরে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম কথাটা কতখানি সত্যি। সমতল বলতে প্রায় কিছুই নেই কেবল পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই আর উৎরাই।

কুম্‌ডি, থলকোবাদ, মনোহরপুর; সালাই-এ সব বিভূতিবাবুর বড় প্রিয় জায়গা ছিল। এই প্রথম এলাম আমি। এবারে বেশ কিছুদিন ঘনঘন আসতে হবে। যতদিন না যথেষ্ট ভালো করে পুরো অঞ্চলটিকে জানছি। বিহারে এক নেতারহাটের পাদদেশ এবং পালামৌর বাগোম্না ব্লক ছাড়া কোথাওই এমন গভীর ও ঘন শালবনের জঙ্গল দেখিনি। শাল ছাড়াও নানারকম গাছ আছে। সেগুন আছে। তবে হয়ত ফেলিং হয়ে গেছে। থল্‌কোবাদ অবধি পরদিন ঘুরে যা দেখলাম তাতে মনে হল সবই নতুন প্ল্যানটেশান। শাল ছাড়া বড় গাছের মধ্যে কারি-কেন্দু, মহানিম, বট, শিশু, কুর্‌চি, ধাতিকা, নিম, ঢেঁাড়া, অসন, করম এবং বাঁশও আছে জায়গায় জায়গায়। কারো নদী বয়ে গেছে ঝর ঝর করে কুম্‌ডি বাংলোর পিছন দিয়েও। ভারী সুন্দরী নদী। ড্যাম বানাচ্ছে বাংলোর পিছনেই। দিনে ব্লাস্টিং এর আওয়াজ এবং রাতে কুলি ও রেজাদের সম্মিলিত নাচ-গানে জায়গাটা মুখর হয়ে থাকে।

জংলী জানোয়াররা বোধহয় পালিয়েছে ভয়ে।

চৈত্র শেষে শালগাছগুলো থোকা থোকা ফুলে ফুলে ভরে গেছে। গন্ধে মম করে জঙ্গল। মহুয়াও ফুটতে শুরু করেছে। কুসুম গাছগুলোতে পাতা এসেছে উজ্জ্বল বাদামী লাল— কোনো গাছে বা নতুন পাতাতে সবুজের ছোপ লেগে গেছে। জংলী আমের গাছে গাছে বোল বা কচি আম এসেছে। কাঁঠাল গাছ ভরে গেছে এঁচড়ে এবং গুটিতে। জংলী বেলও আছে অনেক। আমলকী।

ফলসা জাতীয় কেন্দু ও চাঁর ফল আদিবাসীদের বড় প্রিয়। গিলিরী ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে এখন লাল ফুল ধরেছে, পালামৌতে যাকে বলে ফুলদাওয়াই শিয়ারী লতার নতুন পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাই দিয়ে বড় বড় দোনা বানিয়ে আদিবাসীরা হাটের দিনে হাঁড়িয়া খায়।

এই সব গভীর জঙ্গলে পলাশ কম, প্রায় নেই বললেই চলে। তবে শিমুল অনেক আছে। বিরাট বিরাট গাছ। ফুল ফুটবে, তাই পাতা ঝরিয়ে প্রদীপের আকারে দুধভরা স্তনের মত বীজ বুকে নিয়ে শিমুল অপেক্ষা করছে ঝরাপাতার মর্মরধ্বনির গানের মধ্যে।

এখানে একরকমের ফুল হয় টগরের মত দেখতে, তবে আকারে অনেক বড়, যখন ফোটে; তখন সাদা, পরে হলুদ হয়ে যায়। আদিবাসীরা বলে গরভু। বড় বড় জংলী চাঁপার গাছ আছে। ধাতিং ফুল পাটকিলে-লাল হয়। তাদের রস

নাকি চিনির মত মিষ্টি। চৈত্র শেষে লাল টুকটুকে গোল গোল একরকমের ছোট্ট মার্বেলের মত ফল হয় ঝোপে ঝাড়ে। আদিবাসীরা বলে হেল্। সেই ফল বেটে নদীর জলে মিশিয়ে দিলে নাকি মাছ মরে ভেসে ওঠে। নদীতে মাছ পাওয়া যায় পাহাড়ী চেং। বর্ষাকালে খানাখন্দে মাগুর।

ফেরবার সময় কেওঞ্ঝড়গড় হয়ে ফিরব সিংগাদা মোড়, যশীপুর হয়ে। ব্যানার্জীসাহেব বললেন, উনি একটি বইয়ে পড়েছেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিলেন হনুমান নাকি গন্ধমাদন পাহাড়টার সবটা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি বলে খানিকটা এখনও ওঁর মামাবাড়ির দেশ শুয়াকাটিতে পড়ে আছে।

বিশল্যকরণী এসব জঙ্গলে আছে। মুস্‌কালি, বাচ্চাদের পেটের গোলমালে অব্যর্থ ওষুধ, ওখাই গাছের ছাল, কাটা ছেঁড়া সারায়, চুনকুড়ির ছাল, আমাশার মহৌষধ, কুসুমের নতুন পাতাও খুব পুষ্টিকর। জঙ্গলে হাড় জোড়বার, রক্তপড়া বন্ধ করবার হরেক রকম অব্যর্থ ওষুধের ছড়াছড়ি। আমার পারিধী উপন্যাসে এ সবের অনেক উল্লেখ করেছি।

শুনেছি, সিদ্ধমঠ বলে একটি টিলা আছে বড়বিলের কাছাকাছি। প্রাচীন ছবি আঁকা গুহাও আছে? সে সব কোথায় জানা গেলো না।

কুম্‌ডি বাংলোতে যখন পৌঁছলাম তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে। নানান পাখি ডাকছে চারদিক থেকে। ময়ূর, ধনেশ, টিয়া নানারকম ফ্লাই ফ্যাচার, থ্যাশার, ব্যব্‌লার, নানাজাতের মৌ টুস্‌কি।

চাঁদটা উঠল। দিনের আলো নিভে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে রেইন-ফিভার, বৌ কথা-কও, কপারস্মিথার, ঘুঘু পাখি এবং ক্বচিৎ প্যাঁচা ডাকতে লাগল। মনে হল বসন্ত এখানে আসেনি; না নয় অপগত। কোকিল একেবারেই অনুপস্থিত। আসলে গভীর জঙ্গলে বিশেষ করে শাল-সেগুনের জঙ্গলে কোকিলের ডাক আমি বিশেষ শুনিনি।

ব্যানার্জী সাহেব ত চাঁদনী রাতের জঙ্গল দেখে মন্ত্রমুগ্ধ। বললেন, আমিও থেকে যাই। চন্দ্রভান তাড়াতাড়ি খিচুড়ি বসিয়ে দিল। গাঙ্গুলী ও যাদব হেল্প্ করল।

চৌকিদার হাইড্রোসিল অপারেশান করতে হাসপাতালে গেছে এ কথা আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল রিসার্ভেশান দেবার সময়। ফরেস্ট গার্ডের দেখা-শোনা করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা এসে পৌঁছবামাত্র সে তার শেয়ালে-রঙা আলোয়ান সরিয়ে বাঁ হাতটা উঁচু করে বগলের নীচে এমন একখানা সাদা-হয়ে-ওঠা ফোঁড়া দেখিয়ে দিল যে, তা দেখে টাড়সে আমাদেরই জ্বর আসার উপক্রম।

বললাম, থাক থাক বাবা। তোমাকে দিয়ে কাজ করালে মহাপাতকের কাজ হবে।

রাতে খিচুড়ি খাওয়ার পর ডিজেলের জীপে চেপে অন্যরা চলে গেলেন। আমি আর ব্যানার্জী সাহেব রয়ে গেলাম।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙল নানান পাখীর গানে। প্রাকৃতিক আওয়াজে বাইরে বেরিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দেখি, একজোড়া

লেসার ইণ্ডিয়ান হরন্‌বিলস্‌ এবং একজোড়া ময়ুর। ধনেশ অনেকদিন পর দেখলাম। মহানদীর অববাহিকার জঙ্গল ছাড়া এই ধনেশ আমি বেশী জায়গায় দেখিনি। তবে গ্রেটার ইণ্ডিয়ান হরন্‌বিল্‌স্‌ও আছে নিশ্চয়ই। জঙ্গলের গভীরে।

সকলে ব্রেকফাস্ট সেরে, জীপ নিয়ে আর স্টপগ্যাপ্‌ আদিবাসী সুগানকে নিয়ে "শিকারি" রোড হয়ে থল্‌কোবাদের নীচ দিয়ে করমপাধা মাইনস্‌এ গেলাম। আত্রেয়ী কাজ করছেন এখানে।

দুপুর হয়ে যাওয়াতে না চা পেলাম, না-পান। শেষে, বাণ্ডিল বাণ্ডিল মেঘনা-বিড়ি কিনে খেয়ে ও দান করে সান্ত্বনা পেলাম। সমস্ত পথে কোনোই জানোয়ার পেলাম না। পথে একটি ঝর্ণার বালির নীচে বীয়ার ঠাণ্ডা করে ঝাঁকড়া মহানিম আর কারি-কেন্দু গাছের তলাতে বসে বীয়ার খাওয়া হল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে বাইনাকুলার দিয়ে পাখি দেখছি, এমন সময় একটি কাল ছিপছিপে স্মার্ট আদিবাসী ছেলে লুঙ্গি হাঁটু-অবধি গুটিয়ে তুলে বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়া ছাগলগুলোকে ছুঃ ছুঃ করে তাড়াতে তাড়াতে এসে বলল, আমিই বাংলোর চৌকিদার। সাহেব।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তোমার অপারেশান হয়ে গেল। আসলে ওইই চৌকিদার কিনা সে নিয়ে সন্দেহ হচ্ছিল আমার।

সে বলল, না সাহেব। আমার অপারেশান আর হবেনা। দশদিন ছুটি নষ্ট হল। এই গরম, তার উপর ডাক্তার নেই ; ডাক্তার থাকলে, বেড নেই। এই নিয়ে তিনবার গেলাম।

তার মুখ দেখে মনে হল ভগবানের একটি বিশেষ দান যদি ফুলে ফেঁপে পুরুষের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেই তাহলে তা নিয়ে অপরিচিতর মুখে এত আলোচনা তার আদৌ মনোঃপুত নয়। সে যে কোনো বিশেষ অসুবিধেতে আছে এমন কোন লক্ষণও তার হাঁটা-চলা এবং স্বচ্ছন্দ কথোপকথনে বোঝা গেল না। অতএব, প্রসঙ্গ বদলালাম।

ও বলল, রাতে বেরোবেন ত জানোয়ার দেখতে ?

আমি বললাম, আলো ফেলে জানোয়ার দেখতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া দশ বছর বয়স থেকে শুরু করে আজ থেকে দশ বছর আগে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। এখানকার ধুলোতে এত লোহা যে আমার এই ধুলো হজম হয় না। তুমি বরং ঐ সাহেবকে নিয়ে যেও। বলে ব্যানার্জী সাহেবকে দেখালাম।

চৌকিদার আবার জিগগেস করলো, কোনো ঘাতক অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসেননি ত আপনারা স্যার ?

বললাম, আমার মুখ আছে। তাইই যথেষ্ট। তা ছাড়া আর কিছুই আনিনি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সত্যিই। এই সব অঞ্চলের ধুলোর সঙ্গে পূর্ব-আফ্রিকার গোরোর-গোরো ক্র্যাটারের ধুলোর অনেক মিল আছে। জমে

যাওয়া লাভাস্রোতের ধুলো আর এখানকার এই লোহা ম্যাঙ্গানীজ ডায়োস্কাইডের ধুলো ; দুইই ধাতব পদার্থে ভারী। নাকে কানে ঢুকলে, ভারী ভারী লাগে। তবুও ব্যানার্জী সাহেব এবং বিপ্লব, যে এসেছিল রাতে যাদবের সঙ্গে, আমাকে ছাড়লেন না। ধুলো খেতেই হল বিস্তর। জীপে করে বেরিয়ে একটি খরগোশও দেখলাম না।

মাঝে মাঝেই জীপ থামিয়ে দিয়ে চাঁদনি রাতের জঙ্গলের শোভা ও আওয়াজ দেখছিলাম ও শোনাচ্ছিলাম ওঁদের। ব্যানার্জী সাহেবরা নামতে ভয় পাচ্ছিলেন জীপ থেকে প্রথম বার। তারপর সত্যিই খুশী হলেন। শেষকালে, পথে জীপ রেখে যাদব ড্রাইভারকে পনেরো-কুড়ি মিনিট পর আমাদের পিছনে এসে তুলে নিতে বলে চাঁদের আলোয় বিপ্লব আর ব্যানার্জী সাহেবকে জঙ্গলে হাঁটালাম। এমন নিবিড় জঙ্গলে টর্চ না জ্বালতে দিয়ে চাঁদের আলোয় হাঁটতে ওঁদের মনে জঙ্গল সম্বন্ধে অনেক অহেতুক ভয় কমে গেল বলেই আমার বিশ্বাস।

বিপ্লবরা চলে গেল খেয়ে দেয়ে। আরও কিছুক্ষণ চাঁদ দেখে ও পাখির ডাক শুনে শুয়ে পড়লাম আমরা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ধাঁই-ধাঁই করে দরজা ধাক্কাতে লাগলো চৌকিদার।

হাথ্বী আয়া!

হস্তী অথবা হস্তীনি জানিনা। পায়জামা, পাঞ্জাবী

একেবারেই কুঁচড়ে-মুচড়ে আছে ইস্ত্রীর ইও অবশিষ্ট নেই। এই ভাবে রাতের পোশাকে ভদ্রমহিলার সামনে বেরোনো ঠিক হবে কী না, তা ভাবার সময় পর্যন্ত পেলাম না। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরেই দরজা খুলেই দৌড়ে গেলাম।

একটা এক্‌রা হাতী চৌকিদারের বাড়ির বাগানের কলাগাছ থেকে কাঁচা কলার কাঁদি ভেঙে নিয়ে ঝাঁকড়া বড় কাঁঠাল-গাছের ছায়ায় নিয়ে খাচ্ছে। এত কাঁচকলা? সে আমাশায় ভুগছে কিনা সে কথাও জিগগেস করা গেলো না। ঘুম ভাঙা চোখে গাছতলার অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলাম না প্রথমে। হাতীর পা গুলোকে অন্য গাছের গুঁড়ি বলে মনে হচ্ছিল। যেমন হয়।

হঠাৎ হাতীটা, মানে গাছের গুঁড়িগুলো চলতে আরম্ভ করল। সামনে শুঁড় লুটিয়ে। ভালোকরে দেখার জন্যে আমরা দৌড়ে বাংলোর সামনের গেটের কাছে গেলাম। হাতীটা আমাদের থেকে অনেক আগেই বড় বড় পা ফেলে সেখানে পৌঁছে একটা গাছের ছায়ায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। চৌকিদার ব্যানার্জীসাহেবকে টর্চ জ্বালতে মানা করছিল। এই হাতীটা নাকি টর্চ জ্বাললেই তেড়ে আসে। যাই হোক দয়া করে সে নিরস্ত্র-আমাদের প্রতি তেড়ে-ফুড়ে না এসে গাছের ছায়া ছেড়ে, চাঁদের আলো ভরা বাংলোর সামনের ফাঁকা জমিটুকু ধীরে সুস্থে হেলে দুলে পেরিয়ে নীচের ঢালে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গলের এবং জঙ্গলের জানোয়ারের ভয় বহুদিন হলো আর নেই। কবে থেকে যে, মনে করাও মুশকিল। কিন্তু এত বছর হাতে রাইফেল নিয়েই জঙ্গলে ঘুরেছি। খালি হাতে, একেবারেই খালি-হাতে মাঝে মাঝে যে একটু অসহায়, সম্বলহীন লাগে না, এমন কথা বলব না। পয়েন্ট থ্রি সিক্সটি সিক্স ম্যান লিকার শুনার রাইফেলটা আমার একটা অতিরিক্ত অঙ্গের মত হয়ে গেছিল। রিফ্লেক্স অ্যাকশান এমনই কাজ করত যে নিজেই জানতে পেতাম না কখন সেফ্‌টি-ক্যাচটি সরে গেল এবং গুলি করার পরমুহূর্তেই কখন আবার রাইফেল রিলোড করলাম। বত্রিশ ইঞ্চি ডাবল-ব্যারেল গ্রীনার বন্দুকটির বেলাতেও সে কথাই প্রযোজ্য। কোনো তরুণীর সুন্দর কোমরের মত স্মল অফ দ্যা বাট এর কথা মনে হয় প্রায়ই। সেখানে হাত থাকতো বলে, পৃথিবীতে ভয় কাকে বলে জানিনি কখনও। তাই তারা ছাড়া, মাঝে মাঝেই মনে হয় যে, আমার অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে এবং জঙ্গল পাহাড়ে আগে যে-দাপটের সঙ্গে দিনে রাতে ডোণ্ট-কেয়ার করে ঘুরে বেড়িয়েছি এখন ততখানি বোধহয় আর করতে পারব না। তবে জানিনা, হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যেই এই নিরস্ত্রতাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাব। কিন্তু এমতাবস্থায় কোনো খ্যাঁক-শিয়ালে বা চিতি সাপে পা কামড়ে দিলে বা জংলী শুয়োরে ঢুঁ মারলে বা ভাল্লুকভায়া নাক খামচে নিলে আফশোষের আর অন্ত থাকবে না।

ওরা যদি বন্দুক-হাতে আমার ক্রিয়া-কলাপের খোঁজ খবর

রেখে থাকে তাহলে কখনও আমার উপর বদলা নিশচয়ই নেবে—নিরস্ত্র অবস্থাতেই। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, ওদের ইনটেলি-জেন্স ডিপার্টমেণ্ট্ খুব দড়।

আবার যাব সারাণ্ডাতে। ল্যাণ্ড অব সেভেন হ্যানড্রেড হিলস্-এ। বার বার যাব। যতদিন না, হাজারীবাগ পালামৌর মতই পরিপূর্ণ ভাবে জানছি এই জঙ্গলকে।

তোমার বুদ্ধদেবদা

মহুয়া,

আজ আত্মসমালোচনার দিন। 'নিজেকে নিয়ে, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে, অন্যমনে আয়নার সামনে বসে স্বগতোক্তির স্রোতে ভেসে-যাওয়ার দিন।

জীবনের ভারে একেবারেই চাপা পড়ে গেলাম। স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে চলেছি আঘাটার দিকে। যে দিকে জলের টান, জোয়ার-ভাঁটা, গোন ; বেগোন।

আমার নিজের সব জোরই যেন ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম এ জীবনে নিজের ইচ্ছার হাল ধরে বসে থাকব। দৈনন্দিনতার সংসার ভারের জলস্রোতে কখনও দিকভ্রষ্ট হবোনা। বুঝতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে জোর কমে আসছে মনের শরীরের।

—আশ্চর্য! এত অল্প দিনেই! জীবনের, উৎসাহের, জীবনীশক্তির মোমবাতিকে আমি দু দিকে জ্বালিয়েছিলাম। মোম যে এত দ্রুত পুড়ে যাবে পুড়ে যাচ্ছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। যা-কিছু অন্বিষ্ট ছিল জীবনের একে একে রুজির ডাসটবীনে ধুলিমলিন, অদৃশ্য হয়েছে।

অথচ, এ জীবন থেকে পাওয়ার তেমন কিছুই নেই আমার। আরাম, আদর, যত্ন, ভালোবাসা কোনো স্বার্থহীন নারীর কোমল নরম হাত। তাঁতের শাড়ি; নতুন গন্ধ-ভরা, কোন কোল, মাথা-পেতে শোওয়ার।

পাওয়ার কিছুই নেই। শুধু কর্তব্য আছে, কাজ আছে জেদ আছে, অর্থ নাম-যশ আশা-আকাঙ্ক্ষার জাঁতাকলে আটকা-ইঁদুরের মত আমি।

অথচ আমার নিজের প্রয়োজন বলতে কতটুকু?

আমার ভবিষ্যৎ কি?

যাদের ভবিষ্যৎ ভেবে সততই আমি চিন্তাকুল তারা আমার ভবিষ্যৎ নয়। বর্তমানও নয়। তবে কেন মরা? কেন অন্যের সুখের জন্যে এমন করে তিলে তিলে নিজেকে জ্ঞাতসারে ফুরিয়ে ফেলা? সংসারে আমার জন্যেই যদি আমাকে একজনমাত্র মানুষও না-চেয়ে-থাকে তাহলে সেই-সব তথাকথিত আপনজনদের জন্যে, ভালোবাসার জনদের জন্যে কেন এমন করে আত্মহত্যা করা?

কেন না, আমি বড় নরম বলে। বড় প্রাচীনপন্থী বলে। পরকে দুঃখ দিয়ে যে সুখ পাওয়া যায় সে-সুখ প্রত্যাখান করেছি বলে। কিন্তু পরকে দুঃখ না দিয়ে, কেউ কী সুখী হয়? কখনও কি হয়েছে? কোনদিনও?

সুখ কাকে বলে জানিনা।

যদিও অনেক সুখ পেয়েছি—।

এত সুখ যে, লক্ষ লোকের ঈর্ষার কারণ হয়েছি। খাওয়ার সুখ, পরার সুখ, যশের সুখ, সম্মানের সুখ, অর্থের সুখ নারী-শরীরের সুখ, ভালোবাসার সুখ। অথচ কোনো সুখেই মুখ গুঁজে থাকতে পারিনি বেশীক্ষণ। কোনো সুখই

সত্যিকারের সুখী করতে পারেনি আমাকে। এ এক অভিশাপ!

অর্থ পেয়ে ছুঁড়ে ফেলেছি। যশ পেয়ে পায়ে মাড়িয়েছি। ভালোবাসায় থরথর নারীশরীরে পুরুষালী নম্র প্রচণ্ডতায় প্রবেশ করেই দ্রুতগতিতে ফিরে এসেছি। কখনও বিরক্তির সঙ্গেও। নতুন করে, নতুনতর করে সুখকে প্রতিমুহূর্ত আবিষ্কার করার, ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করে, হতাশ হয়েছি। হতাশ হতে হতে আবার আশা রেখেছি। আশা করে হতাশ হয়েছি। তারপর আবারও আশা করেছি।

এই অনুভূতিতে আমি কী একা? আমরা কেউই কী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জেনেছি? জেনেছি সুখের প্রকৃতিকে? আশা-হতাশার প্রকৃত তাৎপর্যকে? জীবনের গন্তব্যকে? কেউই কি জেনেছি?

অন্যের কথা জানিনা। নিজের কথাই বলতে পারি, প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে নিজেকে নতুন করে জানছি ভাঙছি, গড়ছি, নষ্ট করছি, অপবিত্র করছি, পরমুহূর্তেই আবার পবিত্র করছি, আর এমনি করে নিজেকে জানতে জানতে, ভাঙতে ভাঙতে ভুলের মধ্যে দিয়ে সত্যকে আলোর দিকে ধাবমান শিশুর মত টালমাটাল পায়ে ছুটে চলেছি—।

এই ছোটা দলছুটের ছোটা। এ ছোটার কোনো তাৎপর্য নেই। তাৎপর্য বোধহয় এইটুকুই যে নিজেকে জানতে জানতে তাঁকেই জানার চেষ্টা করছি।

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা, ফুরাবেনা সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

ইতি—তোমার বুদ্ধদেবদা